মানববিশ্বের ছাইভস্ম বা মানসকূটের নগ্ন সত্য: জগদীশ গুপ্তের গল্প

উত্তম পুরকাইত

'ম্যান ইজ এ রাশন্যাল অ্যানিমাল'-এনসাইক্লোপিডিয়ার সংজ্ঞা এই। বিদ্যা-বুদ্ধি মনন-চিন্তন শিল্প-বিজ্ঞান সভ্যতা-সংস্কৃতি ইত্যাদি নিয়ে মানববিশ্বের সীমা যতই আকাশচুম্বী হোক প্রকৃতিপ্রদত্ত পশুসত্তা অস্বীকারের কোনো উপায় নেই। পশুত্বকে নীচতা ভেবে অসুর বধের কল্পনা সম্ভব, বাস্তবিক অসুরবধ অসম্ভব। অসুরের ধারণা যদিও দেশভেদে, কালভেদে, ব্যক্তি বিশেষের ধ্যান-ধারণা অভিজ্ঞতার ভেদ-বিভেদে বদলায়। কিন্তু অসুরকে পদদলিত বা নিয়ন্ত্রণে রাখা বেশ কঠিন। ভগবান (আইডিয়া বা ভাব) শয়তান (প্রাকৃত স্বরূপ)-এর উপর আধিপত্যের চেষ্টা করে মাত্র, শয়তানের আধিপত্য ভগবানকে মানতেই হয়। বলাবাহুল্য এখানে ভগবান ও শয়তান মানবসত্তার দুই রূপ মাত্র। মানুষ মানুষেরই প্রতিপক্ষ। নীতিকথার মত শোনালেও মানুষের জীবনযুদ্ধ যতটা না প্রকৃতির সঙ্গে তার থেকে বেশি অন্তরগত। সামগ্রিকভাবে মানুষ মানুষের প্রাণ নেয় (পশুসত্তা), মানুষ মানুষকে প্রাণ দেয়ও বটে। মানুষ যুদ্ধ বাধায়, মানুষ শান্তিও চায়। ব্যক্তিগতভাবেও মুখ ও মুখোশের তফাৎ খুঁজে পাওয়া আরও কঠিন। কখনো সে সাধু (প্রবৃত্তি সংযম যদি হয় সাধু কর্ম), কখনো সে পশু (প্রবৃত্তির দাস)। তবু, এমন সাদা-কালো সহজ রেখায় বিভক্ত করে মানববিশ্বের পর্যালোচনা করা যায় না। কারণ বহুমাত্রিক। মানববিশ্বের জটিল কারখানা মানব মন। তার ভেলকি বোঝা মোটেই সহজ নয়। নমুনা বৈচিত্র্যে ভরা। স্থূল উদাহরণ বলতে প্রায়শই দেখা যায়, কারও কারও কাছে সাধু সেজে পরপোকার অপেক্ষা ডাকাতি করা হয় সহজ কাজ। প্রাচীনকাল থেকে সাহিত্যকারেরা এসব জটিলতার কথা নানাভাবে ব্যক্ত করে এসেছেন। পুরাণকারগণের বিবৃতি অনুসারে পশু থেকে পশুপতির উত্থান কল্পিত হলেও আদি লিঙ্গদেবকে মহাযোগী, মহাভাব শিব বা মঙ্গল কল্পনা দ্বারা ঢেকে ফেলা যায় না। যোগীশ্রেষ্ঠ-ধ্যানমগ্ন শিব শুধু লোকজীবনে নয় পৌরাণিক সংস্কৃতিতেও লিঙ্গদেব রূপেই পূজিত। দার্শনিকদের মধ্যে মতবিরোধ থাকলেও প্রধানতম মত— মানুষের মানুষ হয়ে ওঠা একটা ধারাবাহিক চেষ্টা মাত্র। কিন্তু সে প্রচেষ্টা বারবার ব্যর্থ হয়। গ্রিক মিথ্ সিসিফাস এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। গড়ানো পাথর নিয়ে উপরে ওঠা ও পড়ে যাওয়া।

আদিতে কৌম-গোষ্ঠী-সমাজ গড়ে ওঠার পূর্বে প্রবৃত্তি শাসনের তাড়না বোধহয় মানুষেরও ছিল না। একপ্রকার হিরোইজম্‌ই মুখ্যভাবে ছিল। দৈহিকশক্তি বা সাহসিকতার বলেই গোষ্ঠীপতিদের উত্থান। আধিপত্য বা ক্ষমতা 'প্রদর্শনের স্বার্থেই প্রবৃত্তি শাসনের ভাবনা। সামন্ততন্ত্রে সমাজ ধর্ম ও রাজ আদেশে মানুষের আদি রূপের একটা আধিপত্যকামী সংস্কার সাধন দীর্ঘকাল প্রচলিত ছিল। আধিপত্যকামী বলছি কারণ, ক্ষমতাবানদের বর্বর এবং করুণাময় ত্রাতা, দুই রূপেই দেখা যেত, আজও যায়। লোকসাধারণের বর্বরতা দেখানোর অবকাশ সেখানে ছিল না, আজও নেই। তাদের উদ্দেশ্যে বলা হত (হয়) ধর্মের দ্বারা পশুত্ব বা বর্বরতাকে নিয়ন্ত্রণ করো। ওদিকে বাহ্য আড়ম্বর হিসাবে নরচন্দ্রমা, মহামান্য, লোকবরেণ্য, লোকতিলক, আদর্শ রাজা— ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত হলেও সামন্ততন্ত্রের ক্ষমতাবানদের ভোগবাসনার কথা ইতিহাস স্বীকৃত। হাজার হাজার স্থাপত্যে তার সাক্ষী। নীতির দোহাই ধর্মের অনুশাসন দিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে ভাল মানুষের কৃত্রিম মডেল যেটা রাখা হত, তার রূপকে সামনে রেখেই দীর্ঘ দিন রচিত হয়েছে সামন্ততান্ত্রিক সাহিত্য। তবে সে সাহিত্যের সঙ্গে উপন্যাসের বা ছোটোগল্পের কোনো সম্পর্ক থাকার কথা নয়। কারণ কথাসাহিত্যের উদ্ভব ধনতন্ত্রের বিকাশের যুগে। আমাদের দেশে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। স্বাভাবিকভাবে জগদীশ গুপ্তের গল্পের সঙ্গেও সামন্ততন্ত্রের আদর্শ মডেলের (আদর্শ মানুষের) কোনো যোগ নেই। তবু উপক্রমিকায় কথাগুলো বলা কারণ জগদীশ গুপ্ত দেখাতে চান সামন্ততন্ত্র ক্ষয়িষ্ণু হলেও সামন্ততান্ত্রিক মনোভাব সমানভাবে সক্রিয়। ওদিকে ধনতন্ত্রে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার বহুমুখী বিকাশ হওয়ায় ভালমানুষ হওয়ার কথা রেনেসাঁর যুগপুরুষদের কাল থেকে আধুনিক রোমান্সের কথাকারও বলে এসেছেন। বাংলা উপন্যাস লেখা শুরুই হয়েছিল নক্সা (পরাণুকরণ ও প্রবৃত্তি তাড়িত বাবুদের বিকৃতি প্রদর্শন) রচনার মধ্যে দিয়ে। 'রাখাল অতি সুবোধ বালক'— এই আদর্শ বিচ্যুত হলে তাদের নিয়ে ব্যঙ্গ-কৌতুক হতে পারে, অথবা বলা যেতে পারে কুমতিতে পেয়েছে। বঙ্কিম উপন্যাসে চরিত্রের মানসিক সংরূপ বলতে সুমতি ও কুমতি। রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যে কলুষ মুক্ত সৌন্দর্যবোধের প্রকাশ। গল্পগুচ্ছের গল্পগুলি বাস্তব কিন্তু তার পটভূমি পদ্মাতীর, কবির জীবনদেবতার লীলাক্ষেত্র। প্রকৃতি ও মানব হৃদয়ের মেলবন্ধনে পাঠককে এক সুন্দর মানববিশ্বে পৌঁছে দেয় অধিকাংশ গল্প। মানব স্বভাবের কূটাভাষ, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক শোষণ বঞ্চনা অত্যাচার-নিপীড়ন ইত্যাদি নিয়ে বেশ কিছু উচ্চারণ গল্পগুচ্ছের কিছু গল্পে আছে— অস্বীকারের উপায় নেই। কিন্তু দরিদ্র প্রজাদের দুঃখ মোচনে তৎপর জমিদার রবীন্দ্রনাথের অসহায় আক্ষেপ, অনুতাপ তাঁর গল্পগুলিতেও ছায়া ফেলেছে। ফলত গল্পগুলি যতটা সহানুভূতি আদায় করতে পারে ততটা মানববিশ্বের অন্ধকারের আশঙ্কা জাগায় না। এ ব্যাপারে বিনোদিনী গল্পটি বা *চোখের বালি* উপন্যাসটি পাঠককে যথেষ্ট ভাবায়। বিমূঢ় অহংকারের আড়ালে মহেন্দ্রের প্রবৃত্তির অসংযম, বিনোদিনীর কামোত্তেজিত

দেহের হাতুড়ির জ্বলুনি-পিটুনি, রাজলক্ষ্মীর উৎকট ঈর্ষার কথা *চোখের বালি*তে আমরা শুনতে পাই। কিন্তু মহেন্দ্রের বিপরীতে বিহারী, বিনোদিনীর বিপরীতে সরলা আশা, রাজলক্ষ্মীর বিপরীতে অন্নপূর্ণা সব কূটাভাষ দুর্বল করে দেয়। উপন্যাসে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি চরিত্রেরই উত্তরণ ঘটে সুস্থ মানববিশ্বে। রবীন্দ্রনাথের সর্বাধুনিক গল্প 'ল্যাবরেটরি'। নন্দকিশোর, সোহিনী, নীলা প্রত্যেকেই ক্যারেকটারের প্রথাগত মূল্যবোধকে ভেঙে দেয়। প্রবৃত্তির অসংযম এদের কাছে দোষের নয়। সোহিনী তো ঘোষণাই করে— "মন যে লোভী, মাংসমজ্জার নীচে লোভের চাপা আগুন সে লুকিয়ে রেখে দেয়, খোঁচা পেলে জ্বলে ওঠে। আমি তো গোড়াতেই নাম ডুবিয়েছি, সত্যি কথা বলতে আমার বাধে না। আজন্ম তপস্বিনী নই আমরা। ভড়ং করতে করতে প্রাণ বেরিয়ে গেল মেয়েদের।" এ গল্পে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সমাজজীবনের চারিত্রিক শুদ্ধতার টাবুকে ভেঙে দিলেও নন্দকিশোরের ল্যাবরেটরি রক্ষায় সোহিনীর ভূমিকা বিজ্ঞানসাধনাকেই এ যুগের মানবাদর্শ করে তোলে। 'ল্যাবরেটরি' রবীন্দ্রনাথ লেখেন ১৩৪৭ সালে। ততদিনে জগদীশ গুপ্ত *বিনোদিনী, রূপের বাহিরে* গল্পগ্রন্থ দুটি লিখে ফেলেছেন। প্রবৃত্তিতাড়িত জীবনের প্রাকৃত রূপের প্রকাশে জগদীশ ততদিনে সিদ্ধহস্ত। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলিকে কৃত্রিম করে তোলে রাবীন্দ্রিক আদর্শ বা তত্ত্ব। জগদীশ গুপ্তের গল্প খানিকটা কুমতির গল্প হলেও রাবীন্দ্রিক আদর্শ, রোমান্টিকতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। শরৎচন্দ্র জগদীশচন্দ্রের অতি প্রিয় লেখক হলেও জগদীশের সঙ্গে তাঁর সামান্য ন্যারেটিভের সাদৃশ্য। সাদৃশ্য কিছুটা প্রথাগত সামাজিক, পারিবারিক পটভূমিকার। কিন্তু বিষয়ভাবনা ও উপস্থাপনা উভয় দিক থেকেই জগদীশ স্বতন্ত্র। আলো নয়, অন্ধকারে দিকেই তাঁর অভিমুখ। জগদীশ লেখেন মানুষের মন্দ রূপের, আদি-রূপের গল্প। আমাদের কথায়-মানববিশ্বের (আদর্শ বা ভাববিশ্বের) ছাইভস্ম প্রতিবিম্বিত হয় তাঁর গল্পে।

দুই

কল্লোলে-র কোলাহলে একমাত্র মৌলিকস্বর জগদীশ গুপ্তের। তারুণ্যের উন্মাদনাকে গায়ে মেখেও তিনি বয়সে, অভিজ্ঞতায় প্রবীণ। পনেরো ষোল বছর বয়সে ভাওয়ালের কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের দেহবাদের ফাঁদে পড়ে নারীতৃষ্ণার কবিতা লেখা শুরু করেন। কিন্তু প্রথম গল্পগ্রন্থ *বিনোদিনী* প্রকাশিত হয় লেখকের চল্লিশ বছর বয়সে। শরৎচন্দ্র প্রভাতকুমারের হাস্যরসে ডুবে থাকা বাঙালি পাঠক কল্লোলের বিদ্রোহী তরুণদের ভিন্নবাস্তবতার সন্ধান বা নাগরিক চোখে আঞ্চলিক জনজীবনের রোমান্টিক বাস্তবতাকে দ্বিধার সঙ্গে মেনে নিলেও জগদীশ গুপ্তকে মানতে পারেনি। অথচ *বিনোদিনী* সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লেখেন— "ছোট গল্পের বিশেষ রূপ ও রস তোমার লেখায় পরিস্ফুট দেখিয়া সুখী হইলাম।" —নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন

মল্লিক, তারাশঙ্কর (জগদীশ গুপ্তের অনুজ) প্রমূখ সমকালীন লেখকেরা প্রশংসা করা সত্ত্বেও *বিনোদিনী*-র গল্পগুলির কি অবস্থা হয়েছিল তা শুনে নেওয়া যায় জগদীশ গুপ্তের শেষ জীবনের চিঠি থেকে—

> ""বিনোদিনী" গল্পের বই ছাপা হইল। ৩০/৩৫ খানা বই একে-ওকে দিলাম, অবশিষ্ট হাজারখানেক বই আমার আর কানুবাবুর "বিনোদিনী" প্যাকিং-বাক্সের ভিতর রহিয়া গেল, পরে কীটে খাইল। লেখক এবং সামাজিক মানুষ হিসাবে আমার কোনো অনুশোচনা নাই, কেবল মানসিক এই গ্লানিটা আছে যে, কানুবাবুর শ'আড়াই টাকা নষ্ট করিয়াছি। আমার নিজের সম্বন্ধে আর একটি কথা এই যে, আমি যদি এখন মরি তবে যাহারা আমাকে চেনেন তাহারা বলিবেন "বয়েস পেয়েই গেছেন"।"
>
> ভূমিকা : *স্ব-নির্বাচিত গল্প* ৭/২/১৯৫৭

অথচ আশ্চর্যের কথা বর্তমানে সর্বাধিক আলোচিত অন্তত দুটি গল্প 'দিবসের শেষে' এবং 'পয়োমুখম্' *বিনোদিনী* গল্পগ্রন্থেরই অন্তর্ভূক্ত ছিল। যদিও 'অন্নদার অভিশাপ', 'পুরাতন ভৃত্য', 'তৃষিত আত্মা' গল্পগুলির কূটৈষণাও ইদানিং আলোচিত হতে দেখি। বস্তুত বাঙালি পাঠক আমৃত্যু জগদীশ গুপ্তের থেকে মুখ ফিরিয়ে থেকেছে। এমন অভিযোগ নেই যে জগদীশের গল্পগুলি ঠিক গল্প হয়ে ওঠেনি। বাংলা দেশের সামাজিক পারিবারিক জীবনের পটভূমিকাতেই গল্পগুলি রচিত। তবে হ্যাঁ, তিনি শুধু গল্প লেখেন নি, সামাজিক পারিবারিক মূল্যবোধে ভাঙন ধরিয়েছেন। মন্দের ভালো হয়ে ওঠার চেষ্টা কোনো কোনো গল্পে থাকলেও পরিণতি সেই মন্দের দিকেই। শুভ বোধের অভাব বড়ো বেশি তাঁর গল্পে। কিন্তু প্রশ্ন হল কল্লোলের কবিরা ঠিকভাবে না পারলেও পরবর্তী আধুনিক কবিরা তো অশুভচেতনা, মূল্যবোধের অবক্ষয়, হতাশা, নৈরাশ্য, গ্লানি, বিষণ্ণতা, বিপন্নতার কথাই পাঠককে শুনিয়ে ছিলেন। সুধীন্দ্রনাথের পিশাচভূক নাস্তিকতা, অমিয় চক্রবর্তীর তির্যক কটাক্ষ, জীবনানন্দের স্বপ্নহীন শান্তিহীন বিপন্নতাকে পাঠক গ্রহণ করতে পারল কিন্তু জগদীশ গুপ্তের দেখানো মূল্যবোধের অবক্ষয় বা মানববিশ্বের ছাইভস্মকে পাঠক গ্রহণ করতে পারল না! উত্তর বোধহয় এরকম, কবিতা যত আধুনিক হয়েছে, নৈর্ব্যক্তিক হয়েছে ততই তার জগৎ বিশ্ব থেকে মহৎ-বিশ্ববোধে উত্তীর্ণ হতে চেয়েছে। দৈনন্দিন জীবন-যাপনের সঙ্গে, পরিচিত সামাজিক পারিবারিক জীবনের পরিসরের সঙ্গে তাকে পাঠক সচরাচর এক করে দেখতে চায় না। কবিতা বোধের বিপন্নতাকে স্বীকার করে, পাঠক তা পড়েন কিন্তু যথাস্থিত জীবনের নিরাপদ আশ্রয় কতটা বিপন্ন তা তাদের ততটা ভাবায় না। কিছু কিছু কবি ভাবলেও অধিকাংশ কবিতার পাঠক ভাবেন না। ঠিক যেমন অনেকেই সভা-সমিতিতে অনেক তাত্ত্বিক কথা বলেন কিন্তু তার সঙ্গে জীবন চর্চায় তাল রাখতে

পারেন না। কবিতার সঙ্গে কথাসাহিত্যের দূরত্ব ঘনিষ্ঠ জীবন অভিজ্ঞতা ও বৃহৎ-বোধের দূরত্ব। বৃহৎক্ষেত্রে বোধের বিপন্নতাকে গ্রহণ করা গেলেও পারিবারিক, সামাজিক বাস্তবতায় মানবিকবোধের বিপন্নতাকে মেনে নেওয়া সহজ নয়। সন্তান মায়ের সৎকারটুকু করবে না, (গল্প : 'মায়ের মৃত্যুর দিনে') পিতার মৃত্যু সংবাদ রটিয়ে ছেলে অর্থ উপার্জন করবে, (গল্প : 'পামর') শ্বশুর পুত্রবধূদের নির্লিপ্ত অভিনয়ে একের পর এক হত্যা করে যাবে (গল্প : 'পয়োমুখম') এসব মানতে গেলে মানবতার কোনো মূল্যই আর থাকে না। মানববিশ্বের এই অর্থহীনতার কথা স্বীকার করতে হলে বড়ো বেশি শূন্য বলে মনে হবে বেঁচে থাকাকে। প্রকৃতই মানুষ তার আদিরূপের আয়নার মুখোমুখি কিছুতেই হতে চায় না। জগদীশ গুপ্তকে তাই একপাশে সরিয়ে রাখতেই হয়।

তিন

অনেক সমালোচক মানিকের পূর্বসূরী হিসাবে জগদীশ গুপ্তকে দেখাতে চান। ঘটনা এই, জগদীশ যখন সমহিমায় লিখে চলেছেন তখনো তিনি ঢাকা পড়েছেন অনুজ তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা। শুধু জগদীশ নয়, ঢাকা পড়েছেন অনেকেই। তার যথোচিত কারণও আছে। জীবনদৃষ্টির মৌলিকতায়, নিজ নিজ শৈলীতে তিন বন্দ্যোপাধ্যায় অনন্য। কল্লোলের পরে এঁরাই বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কথাকার সন্দেহ নেই। তবু এঁদের সমসাময়িক পর্বে যাঁদের নাম এক নিশ্বাসে ক্রমপরম্পরায় উচ্চারিত হয় সে দলেও জগদীশ গুপ্তের ঠাঁই মেলেনি বহুদিন। যদিও সকলের থেকে বর্ষীয়ান, প্রবীণ, পরিণত মন, পরিণত লেখনশক্তি নিয়ে তাঁর আত্মপ্রকাশ। লিখতে লিখতে লেখক তিনি নন। শরৎচন্দ্র প্রভাতকুমারের পরে বাংলা গল্প এভাবে মানব মনের কৃষ্ণগহ্বরে প্রবেশ করে মানবিক মূল্যবোধকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দেবে— কেউ ভাবেনি। অসচেতনভাবে তিনি মানব মনের এই অশুভ চেতনার জগতে প্রবেশ করেন নি। সমসাময়িক ইউরোপের ম্যাগাজিনে যে নানা বিচিত্র বিষয় নিয়ে গল্প লেখা চলেছে তা তিনি জানতেন। সেই আধুনিক গল্পের চলন কোন দিকে সে কথা জানাতে *কালি-কলমে*-র সম্পাদক ঘনিষ্ঠ বন্ধু মুরলীধর বসুকে চিঠিতে লেখেন—

> "শুধুমাত্র সামাজিক ঘটনা লইয়া গল্প লিখিবার রেওয়াজ যখন ছিল তখন একথা বলা চলিত। কিন্তু এখন সে কায়দা নাই। উন্মুক্ত প্রবৃত্তি লইয়াই এবং মনোভাবের বিশ্লেষণ করিয়াই এখন গল্প লেখা চলিত হইয়াছে। কাজেই মানুষের বিভিন্ন প্রবৃত্তির সঙ্গে যার যত পরিচয় বা সেই বিষয়ে যার যত অর্ন্তদৃষ্টি, তার গল্প তত বিচিত্র হইবে।"

সমালোচকেরা মানিকের সঙ্গে জগদীশের সাদৃশ্য বলতে এই দিকটিরই নির্দেশ করেন। উন্মুক্ত প্রবৃত্তি এবং মনোভাবের বিশ্লেষণ। এবার দেখা যাক মনস্তাত্ত্বিকতায় জগদীশ ও

মানিকের অবস্থান ঠিক কোথায়। তাহলেই বোধহয় জগদীশ কেন পাঠকের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হন তার কিছুটা হদিস মিলবে।

মানিকের মনস্তাত্ত্বিক গল্পগুলির বেশির ভাগ আদিম যৌন সম্পর্কের প্রবৃত্তি তাড়িত। যার ভর কেন্দ্র ফ্রয়েডীয় ভাষায় লিবিডো। লিবিডো তৈরি করে বহুবিচিত্র মনোবিকলন। শারীরিক চাহিদাকে কেন্দ্র করে নারী পুরুষের মনোবিকলন বা মনের সর্পিল গতি-প্রকৃতিকে ধরতে চান মানিক। 'প্রাগৈতিহাসিক', (১৯৩৭) 'টিকটিকি', (১৯৩৮) 'শৈলজা শিলা' (১৯৩৮)-র মত গল্পগুলি এই ব্যাপারে জগদীশ গুপ্তের গল্পগুলির কাছাকাছি। প্রবৃত্তির তাড়নায় প্রথাগত মূল্যবোধের ভাঙন দেখানো দুজনেরই উদ্দেশ্য। তবু লেখক হিসাবে জগদীশ ও মানিকের দৃষ্টিভঙ্গি, পাঠকের সঙ্গে কমিউনিকেটের ধরন এক নয়। তাছাড়া এই মনোবিকলনের গল্পগুলির অধিকাংশ মানিক লিখেছেন অল্প বয়সে, জগদীশ বয়সে প্রবীণ হওয়ায় অভিজ্ঞতা ও মনোভঙ্গিতে পরিণত।

'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পের ভিখু দুর্ধর্ষ ডাকাত, খুনি, এমন শক্ত প্রাণ, যে অবস্থায় বন্য পশুও বাঁচে না সে অবস্থাতেও বাঁচে। হিংস্রতা ও যৌন আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তার জীবনীশক্তি দুর্বার। বসন্তপুরে বৈকুণ্ঠ সাহার গদিতে ডাকাতি করতে গিয়ে তার দল ধরা পড়ে, সে কোনো রকমে পালিয়ে বাঁচে। আবার আশ্রয়দাতা দলেরই পেহ্লাদের অনুপস্থিতিতে তার স্ত্রীর কাপড় ধরে টানায় পেহ্লাদের হাতে মার খেয়ে তার ঘরে আগুন লাগিয়ে পালিয়ে যায়। তারপর মহকুমা শহরের খঞ্জ ভিখারি। কিন্তু নারী-সঙ্গ-হীন এই নিরুৎসব জীবন তার ভাল লাগে না। অতীতের উদ্দাম ঘটনাবহুল জীবনটির জন্য তার মন হাহাকার করে। এবার সে ভিখিরি পাঁচীকে জীবন সঙ্গিনী করতে চায়। বাধা আর এক খুনি বসির মিঞা। প্রবৃত্তির তাড়নায় উন্মত্ত ভিখু বসিরকে হত্যা করে পাঁচীকে নিয়ে সদরে পালায়। গল্পের শেষে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন—

> "দূরে গ্রামের গাছপালার পিছন হইতে নবমীর চাঁদ আকাশে উঠিয়া আসিয়াছে। ঈশ্বরের পৃথিবীতে শান্ত স্তব্ধতা।
>
> হয়তো ওই চাঁদ আর এই পৃথিবীর ইতিহাস আছে। কিন্তু যে ধারাবাহিক অন্ধকার মাতৃগর্ভ হইতে সংগ্রহ করিয়া দেহের অভ্যন্তরে লুকাইয়া ভিখু ও পাঁচী পৃথিবীতে আসিয়াছিল এবং যে অন্ধকার তাহারা সন্তানের মাংসল আবেষ্টনীর মধ্যে গোপন রাখিয়া যাইবে তাহা প্রাগৈতিহাসিক, পৃথিবীর আলো আজ পর্যন্ত তাহার নাগাল পায় নাই, পাইবেও না।"

স্পষ্টতই মানব মনের হিংসা ও যৌনতার উন্মত্ত প্রকাশ মানিক দেখিয়েছেন। কিন্তু এ গল্প প্রথাগত মূল্যবোধকে সেভাবে আঘাত করেনি যেমন ভেঙে দেন জগদীশ। ভিখু, পাঁচী, বসির সকলেই প্রথাগত সমাজ থেকে বহিষ্কৃত। তাদের কাছ থেকে কেউ মানবিক মূল্যবোধ আশা করে না। তাদের হিংসা ও যৌনতার প্রদর্শনে সমাজ আতঙ্কিত নয়। আবার গল্পের

শেষে প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকারের কথা গল্পকার বললেও চাঁদ ও পৃথিবীর আলোর প্রচ্ছন্ন প্রত্যাশা লেখক ছাড়তে পারেন নি। অন্ধকারে আলোহীনতায় ডুবে পাঠককে একেবারে নিরাশ করে না এ গল্প। এই সান্ত্বনা, যা পাঠক চায় তা জগদীশ গুপ্তের গল্পে নেই। মানব মনের অন্ধকারকে সত্য ঘোষণা করায় তাঁর কোনো সংকোচ নেই, দ্বিধা নেই।

'টিকটিকি' গল্পটির সঙ্গে জগদীশ গুপ্তের গল্পের তুলনা আগেই হয়েছে। আমরা তাই 'শৈলজা শিলা' গল্পটির কথা বলতে পারি। 'শৈলজা শিলা' গল্পের কথক দার্জিলিং-এর টাইগার হিলের পাদদেশ থেকে যে পার্বত্য কন্যাটি তুলে এনে মানুষ করে, সে তাকে দাদু বলে সম্বোধন করলেও পনেরো বছর পরে কথকের মনে হঠাৎ ভূমিকম্প বাৎসল্যের শক্ত প্রাচীর ফাটিয়ে যৌবন শক্তি জেগে ওঠে। কথকের ইচ্ছে হয় শিলাকে তার প্রিয়তমা করে তুলতে। একদিন গুহা আলো করে জন্মেছিল মেয়েটি এখন ঘর আলো করে ঘুরে বেড়াতে দেখে কথকের মনে হয়—

> "মেয়েটা যে এত সুন্দর এ যেন আমার অবিশ্বাস্য সুখ। কত কি মনে হয়। পিছু হাঁটিতে হাঁটিতে আমি যেন একেবারে কৈশোরের প্রান্তে গিয়া দাঁড়াই, ওর ওই টানা চোখ আর রাঙা ঠোঁট আর অপূর্ব-গঠন তনু আমাকে সেই খানে আটকাইয়া রাখে। রাতদুপুরে তার ঘরের দরজায় টোকা দিয়া অদ্ভুত গলায় ডাকি, 'শিলা'!"

না প্রৌঢ় কথকের যৌন আবেদন শিলা বোঝে না। অন্ধকারে ভয় পেয়ে শিলা বলে— "আমি তোমার ঘরে শোব দাদু দরজা খোল।" —তৃষিত প্রৌঢ় আত্মদমনে অসমর্থ হয়ে শিলাকে সজোরে ধমক দেয়। প্রতিবেশি সান্যাল রসিকতা করলে— 'তুমি নিজেই বিয়ে করে ফেল না হে!' কথক খুশি হয়ে বলে— 'তা মন্দ বলনি সান্যাল'!— কিন্তু শিলার কাছে প্রস্তাব দিলে—

> "কিন্তু চিরকাল নাতনী হয়েই থাকবি? বৌ হয়ে থাক না!'
> 'দূর ছোটলোক!' 'বলিয়া সে হাসে।"

তবে শিলাকে চুম্বন করার মত অবস্থা একদিন কথক তৈরি করে ফেলে। ধরা পড়ে ছুটে পালায়। কারণ চুম্বন যে লভ্ রাইটের সভ্যসংস্করণ শিলা তা না জেনে ভয় পেয়েছে। অনেক চেষ্টায় শিলার মন ভোলালেও শিলার পরিণত কথন কথকের দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে তোলে— "খেতে দিচ্ছ, পরতে দিচ্ছ, রাগ আর কি করে করি দাদু!" —ততদিনে ভূপেন এসে শিলার যৌবনকে জাগিয়ে তুলেছে। ভূপেন শিলাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে কথক শিলাকে হারানোর ভয়ে তাকে নিয়ে পালায়। ভূপেনের প্রশ্নে তার উত্তর— "কোথা যে যাচ্ছি আমিও জানি না হে! কোনো গুহা-টুহায় আশ্রয় নেব ভাবছি।"— উন্মত্ত বাসনা তাড়িত কথকের কৈফিয়ৎ—

> "ভূপেনের হাতে শিলাকে সঁপিয়া দিয়া আমি শূন্য ঘরে বুক চাপড়াইলে আপনারা খুবই খুশি হন, কিন্তু তাহাতে আমার কি লাভ? কেনই বা শিলাকে আমি ছাড়িব!

বিলাইয়া দিবার জন্য এত কষ্ট করে এত যত্নে আমি ওকে মানুষ করি নাই। গুহায় ফেলিয়া আসিলে ও বাঁচিত না। আমি ওর প্রাণ রক্ষা করিয়াছি। আমার চেয়ে ভূপেনের অধিকার বেশি কেমন করিয়া?"

কথক লেখকের প্রকাশ্য ঘোষণা— 'শিলাকে আমি ভালোবাসি।' তার আরও দাবি এই ভালবাসার দায় তারও নয় শিলারও নয়। লেখকের সাহসি বর্ণনা—

"আমি যে আমার বিশাল লোমশ বুকে দুই হাতের হাতুড়ি দিয়া কচি মেয়েটাকে ছেঁচিতে চাই ইহার মধ্যে আমিও নাই শিলাও নাই, আছে শুধু অনাদি অনন্ত শ্বাশত প্রেম, পশু-পাখী মানুষকে আশ্রয় করিয়াও যে প্রেম চিরকাল সমগ্রতা বজায় রাখিয়াছে। আমি আর শিলা তো শুধু ক্রীড়নক।"

—কথকের শিলার উপর শেষ আক্রমণও বড়ো বেয়াব্রু— "তবে দরজা খোল। ভয় মিটিয়ে নে।" — কিন্তু শিলার কঠিন উত্তর— "এমন যদি কর, যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাব।"

গল্প শেষ হয় কথকের হতাশা ও ক্রোধ নিয়ে— "কিন্তু চিরকাল রসে ডুবাইয়া রাখিলেও শিলা কেন গলিবে না ভাবিয়া মাথা গরম হইয়া ওঠে।"

এ গল্পেও মানিকের প্রয়াশ সাহসি। কিন্তু তাকে সবলীল বলা যাবে না। শিলাকে কোনো ভাবেই এই আদিম খেলায় নামানো যায়নি। কথক তার যৌনক্ষুধা নিয়ে অসংকোচে ঝাঁপিয়ে পড়তেও পারেনি। কঠিন শিলার কাছে কামুক প্রৌঢ় কথক পরাজিত। ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের যে প্রচলিত বিশ্বাসকে ভাঙবেন বলে লেখক অগ্রসর হয়েছিলেন তা পারেন নি। যে ভাঙন আমাদের সম্পর্কের পারিবারিক সামাজিক অস্তিত্বকে নাড়িয়ে দিতে পারত বস্তুবাদী লেখকের লুকানো আদর্শ তাতে বাধ সেধেছে। পাঠক লেখকের সাহসি পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানিয়েও গল্পটিকে গ্রহণ করতে দ্বিধা করেনি।

জগদীশ গুপ্ত 'আদি কথার একটি' (১৯২৯), 'অরূপের রাস' (১৯২৯), 'চন্দ্র-সূর্য্য যতদিন' (১৯২৯), 'শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী' (১৯৩৫), 'রসাভাস' (১৯৩৫), 'শঙ্কিতা অভয়া' (১৯৪৭) 'কলঙ্কিত সম্পর্ক' (১৯৫২)-র মত গল্পগুলিতে যৌন সম্পর্কের অকৃত্রিম রূপ ও তার মনোবিকলনকে দেখিয়ে এ বিষয়ে প্রচলিত বিশ্বাসগুলিকে সম্পূর্ণভাবে নাড়িয়ে দিয়েছেন। গল্পগুলি বহু আলোচিত তাই পুনরায় আলোচনার প্রয়োজন নেই। কেবলমাত্র 'শৈলজা শিলা' গল্পটির সূত্রে 'শঙ্কিতা অভয়া' গল্পটি সম্পর্কে দু-চার কথা বলার প্রয়োজন আছে। এই গল্প দুটিতে যে যৌন জটিলতার কথা বলা হয়েছে তা উত্থাপনের প্রথম কৃতিত্ব অবশ্যই মানিকের। সময়ের নিরিখে 'শৈলজা শিলা' 'শঙ্কিতা অভয়া'র দশ বছর আগে লেখা। তার মানে পাঠক জগদীশের 'শঙ্কিতা অভয়া' গল্প পাঠের আগেই নারী-পুরুষের সম্পর্কের এই জাতীয় যৌনতাড়না (পালিত কন্যার প্রতি আসক্তি) সম্পর্কে জানতেন। তবু 'শৈলজা শিলা' গল্পের পাঠকেরা 'শঙ্কিতা অভয়া' পাঠে শঙ্কিত হলেন কেন তা আমাদের ভাবতে হবে।

'শৈলজা শিলা'য় প্রৌঢ় কথকের শত প্রচেষ্টাতেও শিলা গলেনি। 'শঙ্কিতা অভয়া'র বছর পঁয়তাল্লিশের সুস্থ সবল ধনবান অতুল বাজায় এসরাজ আর সেই বাজনার সঙ্গে নাচে শান্তি। বাবার এসরাজের সঙ্গে নৃত্যভঙ্গিতে প্রেমের ইন্দ্রজাল রচনা করে। বাবা মেয়ে একসঙ্গে 'মাধুকরী' ফিল্ম দেখে। নিঃসংকোচে বাবার সঙ্গে ফিল্ম নিয়ে শুধু আলোচনা করেনি মায়ের উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গও ছুঁড়ে দেয়—

> "বাবা, মা যদি দেখে তবে মা কী বলবে! মূর্ছা যাবে হয়তো। সন্তানের উদারান্নের জন্য নানা পুরুষের পরিচর্যা করা অথচ কায়মনে যথার্থ সতী। উঃ, মা তো ভাবতেই পারে না।"

বস্তুত অভয়া শঙ্কিত হয়ে বাপের কুশিক্ষাকে দায়ী করলেও শান্তি ও অতুলের মনে কোনো দ্বিধা-সংকোচ নেই, পাপবোধও নেই। আর এখানেই বোধহয় জগদীশ গুপ্তের পাঠক জগদীশ গুপ্তকে ত্যাগ করেন। মানববিশ্বের প্রচলিত বিশ্বাসের এমন সাবলীল ভাঙন উনিশ শতকের নবজাগরণের শিক্ষায় আলোকিত পাঠক কোনোভাবেই মানতে পারেনি। জগদীশের নর-নারীরা প্রকৃতির উর্ধ্বে উঠতে পারেনি, এই তাদের বা লেখকের অপরাধ। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে দাঁড়িয়ে প্রতিদিনের নিউজ চ্যানেল বা খবরের কাগজগুলির দিকে তাকালে জগদীশ গুপ্তের দৃষ্টিকে কি অভ্রান্ত বলে মনে হয় না আমাদের!

প্রসঙ্গত পাঠকদের রুশ সাহিত্যের নবোকভের লেখা 'লোলিটা' (১৯৫৫)-র কথা নিশ্চয় মনে পড়বে। বিশ শতকের গোড়ার দিকে ইউরোপীয় আধুনিকতার ধাক্কায় রুশ সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের পুরাতন প্যাটার্ন ভেঙে পড়ে। স্কুল-কলেজের উন্মুক্ত স্বাধীনতা পারিবারিক সম্পর্কের প্রচলিত বিশ্বাসকে ভেঙে দেয়। নবোকভের লোলিটা তার সৎ বাবাকে যৌন সম্পর্কে জড়াতে অবাধ প্ররোচনা দিয়ে যায়। 'শঙ্কিতা অভয়া' গল্পের শান্তিও সৎ বাবা অতুলের খুবই ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল। তবে জগদীশ এই সম্পর্ককে সাবলীল করে তোলেন অতুলের শিল্পী মনের উদার আধুনিকতা দিয়ে। অভয়া সেই আধুনিক শিল্পী মনের অধিকারী নয় বলেই শঙ্কিতা হয়ে পড়ে। তবু ভিন্ন দেশ ভিন্ন পরিবেশের কথাকার হলেও বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সাহিত্যে নবোকভ ও জগদীশ গুপ্তের অবস্থানকে খুব কাছাকাছি বলেই মনে হয়।

চার

জগদীশ গুপ্ত কল্লোলীয়দের মতো প্রচলিত সাহিত্যরীতির বিরোধিতায় সোচ্চার না হয়েও মানবিশ্বের সর্বপ্রকার ভাঙন দেখাতে তৎপর। বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধনের ভাবাদর্শগুলি ভূলুণ্ঠিত, সামাজিক পারিবারিক পরিসরে সামন্ততন্ত্রের অবশিষ্ট মূল্যবোধের পরিসমাপ্তি; অন্যদিকে ব্যক্তিসত্তার স্বাধীন বিচরণের যে বহুমুখী পথ উনিশ শতকের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে খুলে গিয়েছিল বিশ্বযুদ্ধে তা পড়ল মুখ থুবড়ে।

রোমান্টিকতা নিছক বিলাসিতা তখন। মানুষের আদিরূপকে ঢাকা দেবার মত আচ্ছাদন, সুন্দর হয়ে ওঠার সাধনা বা শুভবোধের প্রতি আস্থার মত নিছক মেকি বিশ্বাস জগদীশ খুঁজতে যাননি তাঁর গল্পগুলিতে। কোনো লুকানো আদর্শে মুখ ঢাকেন নি। পাঠক বা প্রকাশকের তৃপ্তির জন্য মনভোলানোর কোনো সহজ পথে হাঁটেন নি। তৈরি করেননি বক্তব্যের জটিলতা। আপাতভাবে তাঁর গল্পের চলন একটু তেড়াবেঁকা হলেও তাঁর যেকোনো আখ্যান পাঠককে অন্ধকারের দিকেই টেনে নিয়ে যায়। শুধু বাহ্য ঘটনা দিয়ে নয় চরিত্রের মনোবিশ্লেষণের দ্বারা বুঝিয়ে দেন, মনুষ্যত্বের যে ভাবাদর্শ যুগ যুগ ধরে মানুষ গড়ে তুলেছে তা কত ক্ষণভঙ্গুর। অথচ একঘেয়ে নয় তাঁর গল্পবিশ্ব।

জগদীশ গুপ্তের গল্পগ্রন্থ— *বিনোদিনী* (১৩৩৪), *রূপের বাহিরে* (১৩৩৭), *শ্রীমতী* ১৩৩৭), *উদয়লেখা* (১৩৩৯), *রতি ও বিরতি* (১৩৪১), *উপায়ন* (১৩৪২), *পাইক শ্রীমিহির প্রামাণিক* (১৩৪২), *শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী* (১৩৪২), *তৃষিত সৃক্কণী* (১৩৪৬), *মেঘাবৃত অশনি* (১৩৫৪), *কলঙ্কিত সম্পর্ক* (১৩৬৭), *অঞ্জন শলাকা*, *ভৃঙ্গার*, *দাসী*। তাঁর গল্পে সমসাময়িক দেশ কালের বৃহৎ ঘটনার ছাপ সচরাচর লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু বাহ্য ঘটনার অন্তরালে মানব মনের অন্ধকার কীভাবে ঘনীভূত হয়, তার উপস্থাপনা দেখে বিস্মিত, হতবাক হতে হয় পাঠককে। প্রথমত *বিনোদিনী* গল্পগ্রন্থের একটি বহু আলোচিত গল্পের কথাই ধরা যাক। 'দিবসের শেষে' (১৩৩২) গল্পটিকে প্রায় সব আলোচক নিয়তির অমোঘলীলা অথবা নিষ্ঠুর জীবন পরিণতির ইঙ্গিতবাহী গল্প হিসাবে দেখাতে চান। রতি নাপিতের স্ত্রী নারাণী তিনটি পুত্রকে প্রসবগৃহ থেকে কামদা নদীতে নিক্ষেপ করার পর একটি মাত্র পুত্র পাঁচু রক্ষা পায়। বহু মাদুলি তাবিজ বাঁধার পরও নারাণীর উৎকণ্ঠা ঘোচে না। এরই মধ্যে পাঁচ বছরের পাঁচুর আকস্মিক ঘোষণা— 'মা, আজ আমায় কুমিরে নেবে।' —পরিশেষে যে কামদায় কেউ কখনো কুমির দেখেনি সেখান থেকেই পাঁচুকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় কুমির। বস্তুত পাঁচুর ভবিষ্যৎবাণী মিলে যাওয়ায় পাঠক যত না বিস্মিত তার থেকে বেশি আতঙ্কিত। এ আতঙ্ক মৃত্যুর, মৃত্যু ভয়ের। মৃত্যুর মতো অসম্ভব, আকস্মিক কিছুই নেই। তার সমস্ত কারণ যে যুক্তির শৃঙ্খলায় আবদ্ধ তা বলা যায় না। মৃত্যু তো ছায়ার মতো জীবনকে অনুসরণ করে। জার্মান দার্শনিক হাইডেগার (১৮৮৯-১৯৭৬) বলেন— 'মৃত্যু আমাদের জন্য ওঁৎ পেতে বসে আছে, কখন ঝাঁপিয়ে পড়বে জানি না।' জগদীশ গুপ্তের আগে আর কারো গল্পে এই আতঙ্কের ছায়া দেখা যায় না। এতদিনের মানবতাবাদী সাহিত্য বাঁচবার প্রেরণা দিয়েছে, দুঃখে-দারিদ্র্যে বিপদে-আপদে উঠে দাঁড়াবার সাহস যুগিয়েছে। আর এ গল্প আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় জীবনের মৃত্যু পরিণতির কথা। মানবাদর্শের স্বপ্নে বুঁদ হয়ে সচরাচর আমরা যেকথা ভুলে যাই। আদর্শবাদীরা এই জীবনবিমুখতা মানতে না পারলেও বিংশ শতাব্দীর কবি সাহিত্যিকেরা মৃত্যুপরায়নতার কথা না ভেবে পারেন নি। কারণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়ঙ্কর অভিঘাত থেকে মৃত্যু আতঙ্কই

তো মানবিক সভ্যতাকে তাড়া করে ফিরেছে। আমরা নিশ্চয়ই ভুলে যাব না এই গল্পের সমসময়ে লেখা ডব্লু. বি. ইয়েট্‌সের (১৯২৫) 'টাওয়ার' কবিতাটির কথা; যেখানে যুদ্ধে ভেঙে পড়া টাওয়ারে মৃত্যু জর্জর কবি; যার মাথায় ঘুরছে ঈগল; যে কবি মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাঁর সুন্দরতম কল্পনাগুলো নিয়ে কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না— 'হোয়াটস্ শ্যাল আই ডু উইথ দিস্ এ্যাবসার্ডিটি'। একইভাবে লণ্ডন ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে মহাকবি এলিয়টের মানুষের চলমান শোভাযাত্রাকে দেখে মৃত্যুর কথাই মনে পড়ে। আবার ঠিক এই মৃত্যুর গল্পই তো জীবনানন্দ আমাদের শুনিয়েছিলেন 'বোধ' কিংবা 'আট বছর আগের একদিন' কবিতায়— 'শোনা গেল লাসকাটা ঘরে নিয়ে গেছে তারে'। কিন্তু কবির পৃথিবী মহাপৃথিবী, আবহমান সভ্যতার ইতিহাসের বাহক তিনি। তাই মৃতসত্তার সঙ্গে জীবনের যূথবদ্ধ লড়াই তিনি চালিয়ে যান। কথাসাহিত্যিক সমসাময়িক অভিঘাতকে এভাবে অতীতচারী করে তুলতে পারেন না। বরং একরত্তি শিশুর মুখ দিয়ে আকস্মিক মৃত্যু আতঙ্কের বার্তা দিয়ে মানববিশ্বের দীর্ঘস্থায়ী ভিত্তিকে নাড়িয়ে দিতে পারেন।

বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ সংবাদ পাওয়া যায় ১৯৩০ সালে লেখা জগদীশ গুপ্তের 'কুপুত্র' গল্পে। গল্পকার লেখেন—

> "হঠাৎ একদিন পৃথিবী জুড়িয়া যে কাণ্ড বাধিয়া গেল তাহা ওদিকে যেমন রোমাঞ্চকর, এদিকে তেমনি দুর্ব্বহ। সমগ্র বিশ্বের খাদ্য পেয় পরিধেয় যেখানে যে উপকরণ ছিল সব যেন সেই ধ্বংসযজ্ঞের ধূমাবর্তে গিয়া পড়িতে লাগিল।"

শুধু যুদ্ধের প্রসঙ্গ নয়, খাদ্যসংকট, বস্ত্রসংকট, দারিদ্র্য, বেকারত্ব যুদ্ধ পরবর্তী সভ্যতার সমস্ত ভয়ঙ্করতার কথা উচ্চারিত হয়েছে এই গল্পে—

> "গুরুভার চক্রের নিম্নে পড়িয়া তিনটি প্রাণী অবিরাম নিষ্পেষিত হইতে লাগিল।...
>
> 'মাসের প্রথম দিন দশেক ঘরে আলো জ্বলে, তারপর আর জ্বলে না— সন্ধ্যা বন্দনার পর কল্যাণকর মৃৎপ্রদীপটি গৃহস্থ চোখের জল আঁচলে মুছিয়া ফুঁ দিয়া নিবাইয়া দেয়...'
>
> '—কাপড় এনেছি, মা। বলিয়া রতন বাহিরের দরজা হইতে সাড়া দিতেই শৈবলিনী ছিটকাইয়া উঠিয়া ঘরে ঢুকিয়া গেল...
>
> রতন দু'খানা ধোয়া কাপড় দাওয়ায় নামাইয়া রাখিয়া পূর্বের মত অপেক্ষা করিতে লাগিল...
>
> বলা বাহুল্য, শৈবলিনী লুকাইয়াছিল— আড়াল হইতেই বলিল,— কাপড় দেব না, রতন।
>
> কেন, মা?
>
> 'কেন'র উত্তর ছিল না, শৈবলিনী কথা কহিল না...
>
> —কাপড় দু'খানা রহিল। বলিয়া রতন চলিয়া গেল।...

শৈবলিনী বধূর দিকে চাহিয়া তাড়াতাড়ি সজল চক্ষু ফিরাইয়া লইল।
পরণের কাপড়ের উপর ছেঁড়া আলোয়ান জড়াইয়া শৈবলিনীকে ছেলের সম্মুখে বাহির হইতে হয়।"

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে ১৯৪৭-এ লিখেছিলেন 'দুঃশাসনীয়'— এখানেও জগদীশকে মানিকের পূর্বসূরী বলতে হবে। গল্প দুটি তুলনার লোভ সম্ভরণ করতে হল।

তবে যুদ্ধ সম্পর্কে এত কথা থাকলেও যুদ্ধ এ গল্পের প্রধান কথা নয়। কারণ— 'নরমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত হইয়াছে, যজ্ঞের ফল বণ্টন করিয়া লওয়া হইয়াছে... পৃথিবী পুনরায় "জীবনের নিত্যস্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে...।" অর্থাৎ যুদ্ধের সমস্ত অভিঘাত পেরিয়ে যায় জননী শৈবলিনী ও পুত্র কুলদার মাথার উপর দিয়ে। অর্থসঙ্কট থেকে ছেলেকে নিষ্কৃতি দিতে শৈবলিনী কখনো নিজের মৃত্যু কামনাও করেছেন। কুলদা দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে পড়াশোনা করেছে, চাকুরি করেছে, মায়ের প্রতি তার ভক্তি অকৃত্রিম। কিন্তু যুদ্ধের অভিঘাত কুলতাকে পুনরায় সর্বস্বহারা করেছে। তবু কোথাও সে-অর্থে 'কুপুত্র' হওয়ার লক্ষণ ছিল না। কুলদার 'কুপুত্র' হয়ে ওঠার ঘটনাটি ঘটে শেষ দৃশ্যে।

"বড় রাস্তায় উঠিয়াই কুলদা অবাক হইয়া দাঁড়াইল... প্রকাণ্ড মিছিল চলিয়াছে... পতাকায় 'স্বাধীনতা' টুপীতে 'স্বাধীনতা'... মাঝে মাঝে মাতৃ-বন্দনার তুমুল ধ্বনি উঠিতেছে— তাহাতে 'দ্বিগন্ত কম্পিত' হইতেছে কিনা কে জানে, কিন্তু কুলদার বিষন্ন চক্ষু দুটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল...

এত বড় ঘটনার কুলদা কিছুই জানত না। কুণ্ডলিনীপুরের দেবীবল্লভবাবু সাতপুরুষের বিরাট ধনী হয়েও দেশের জন্য একুশ দিন জেল খেটে মুক্তি পেয়েছেন, তাই এই উল্লাস। এইবার—

"কুলদার বুকের ভিতর ঝম্ ঝম্ করিতে লাগিল; কিন্তু ঘরের টান কাটাইয়া সে নড়িতে পারিল না।"

দেশের মহৎ কর্মযজ্ঞে অংশ নিতে না পেরেই কুলদা কুপুত্র। প্রশ্ন হল পড়াশোনায় ভাল, সংগ্রাম করে বেঁচে থাকা ছেলেটি ঘরের টান কাটাতে পারল না কেন? এখানেও জগদীশ গুপ্ত কুলদার মনোবিশ্লেষণ করে প্রচলিত মূল্যবোধের ধারণাকে ভেঙে দিয়েছেন। উনিশ শতকের রেনেসাঁ, নব্য শিক্ষিত তরুণদের মনে ফরাসি বিপ্লব, সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার মন্ত্র, জাতীয়তাবোধ, দেশপ্রেম, স্বাধীন মুক্ত স্বদেশ গঠনের স্বপ্ন ইত্যাদি পরাধীনতা বা ঔপনিবেশিকতা থেকে জন্ম নেওয়া ভাবাবেগ। পড়াশোনায় ভাল হলেও কুলদা পরিবারের অতিরিক্ত কারো কথা ভাবেনি। এমন আত্মকেন্দ্রিক মানুষের পক্ষে বৃহৎ আদর্শের ভাবাবেগে অংশ নেওয়া সম্ভব নয়। কোনো দিনই কোনো দেশের সমস্ত মানুষ ব্যক্তিস্বার্থের অতিরিক্ত আদর্শের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েনি। পরিস্থিতি কখনো ব্যক্তিকে

প্ররোচিত করে বটে বিপদের আশঙ্কা কেটে গেলে বৃহৎ আদর্শকেও কৃত্রিম ভাবাবেগ বলে মনে হয়। এই গল্পের কুলদা তেমনি এক প্রাকৃত সত্যকেই সামনে এনে দেয়। তাছাড়া ধনী দৈবীবল্লভবাবুদের দেশপ্রেম মেকি, সাময়িক আবেগে দেশব্রতে অংশ নিয়ে লোকচক্ষুর কাছে দেবতা হয়ে উঠেছেন। কুলদা সে আবেগে সাময়িক বিচলিত হলেও ঘরের টান উপেক্ষা করে সে কৃত্রিম স্রোতে ভেসে যেতে পারে না। কুপুত্র হয়েও না।

সমাজ পরিবারের দীর্ঘ লালিত সামন্ততান্ত্রিক সংস্কার জগদীশ গুপ্ত তাঁর অনেক গল্পেই ভেঙে দিয়েছেন। জগদীশ গুপ্ত যখন গল্প লিখছেন তখনো গ্রামজীবনে সমাজপতি বা পরিবারতন্ত্রের দাপট যথেষ্ট। বিবাহিত পুত্রও পরিবারের কর্তা বা পিতার অধীন। 'পয়োমুখমে' এই পরিবারতন্ত্রের হিংস্রতার বলি হতে হয়েছে নিরপরাধী দুই কিশোরীকে। ভূতনাথের প্রতিরোধে তৃতীয় বধূটি রক্ষা পেয়েছে। 'পর্ব্বত ও পার্ব্বতী' গল্পে অখণ্ড সমাজপতির দাপট খণ্ড ক্ষুদ্র করে দিয়েছে পাশের গ্রামের মেয়ে ভুবনেশ্বরের স্ত্রী পার্ব্বতী ও শাশুড়ি দক্ষবালা। 'পর্ব্বত ও পার্ব্বতী' গল্পটি প্রকাশিত হয় শারদীয়া হিন্দু পত্রিকায় ১৩৫৬ সালে। এই গল্পের নায়ক দিনপতি রায় খণ্ডগ্রাম বা খাঁড়গাঁয়ের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। নিজের অস্তিত্ব বোঝাতে নিজেকে 'আমি' সম্বোধন না করে 'দিনপতি রায়' ঘোষণা করা সমাজপতির সামন্ততান্ত্রিক অহংকেই জাহির করে। না, দিনপতি জমিদার বা রাজা নয়, খণ্ডগ্রামের বাইরে মুষ্টিমেয় লোক তার নাম শুনেছে মাত্র কিন্তু মেজাজে মনোভাবে তাঁর অস্তিত্ব উপেক্ষণীয় নয় এই খণ্ডগ্রামের সংকীর্ণ পরিসরে। গ্রামের আর যারা বৃহৎ সুনামের অধিকারী যাঁরা এই গ্রামের গুরু নেতা অভিভাবক হতে পারতেন অনায়াসে তারা গ্রামের বাইরে থাকাতেই দিনপতির আধিপত্য আরও প্রকট হয়ে পড়েছে। ইঙ্গিতে গল্পকার বুঝিয়ে দেন দীর্ঘ সামন্ততন্ত্রের অধীনে বাস করায় এই একটা সংস্কার পরিবার সমাজ বয়ে বেড়ায় তার অভিভাবক থাকা চাই, পরিবার বা সমাজ থেকেই কাউকে না কাউকে অভিভাবক সাজতে হবে। পরিবার বা গ্রামকে অভিভাবক শূন্য ভাবা যাবে না। রামচন্দ্রের শূন্যতা ঢাকতে তাঁর পাদুকাকেই সিংহাসনে সাজিয়ে রাখতে হয়। রাজতন্ত্র বা সামন্ততন্ত্র নিঃশেষিত হলেও এই পাদুকাধারীরা থেকেই যান। জগদীশ গুপ্ত সামন্ততন্ত্রের এই অবশিষ্ট সংস্কারের বুকেও শেষ পেরেকটি পুঁতেছেন 'পর্ব্বত ও পার্ব্বতী' গল্পে।

পর্ব্বতের কাছে মহম্মদ সর্বদা না গেলে পর্ব্বত নিজেই চলে আসে মহম্মদের কাছে। এ ধরনের লোকপ্রবাদ গ্রাম্যজীবনে শোনা যায়। ভুবনের মা কামিনী পুত্রবধূর উপর অন্যায় নির্যাতন করে চলেছে। কামিনী বড়ো কড়া শাশুড়ি। পুত্রবধূর সামান্য ভুলত্রুটি সহ্য করতে পারে না। ভুবনও মায়ের ভয়ে তটস্থ থাকে। এরই মাঝে ভুবন হঠাৎ মাকে না জানিয়ে শ্বশুরবাড়ি দু-তিন রাত কাটিয়ে আসে। খবর ভুবন পাঠিয়েছিল প্রতিবেশীর হাতে কিন্তু সে জানাতে ভুলে যাওয়ার ছেলের জন্য সারা রাত অপেক্ষায় থেকেছে। দ্বিপ্রহর রাতে ভুবনের শ্বশুরবাড়ি যাবার খবর জানার পর কামিনীর—

"জ্বলন্ত ব্রহ্মাণ্ডের জ্বালায় ক্ষিপ্ত হইয়া দ্বি-প্রহর রাতে, এবং সেখানে দাঁড়াইয়াই, আর, পৃথিবীকে শুনাইয়া পুত্র ভুবনেশ্বরকে অভিসম্পাত দিল ইহাই বলিয়া যে, যেই পুত্র মাকে লুকাইয়া আর মাকে যন্ত্রণা দিতে শ্বশুরগৃহে যাইয়া স্ত্রীর পদতলে লুটাইয়া পড়ে, আর, মায়ের চাইতে স্ত্রীকে যে-হতভাগ্যের মধুরতর মনে হয়, পরিণামে তাহার, সেই নির্লজ্জ মাতৃঘাতী স্ত্রীলোভীর, চরম দুর্গতি ঘটিবেই— কলিকালেও তাহা ঘটিয়াছে কারণ এখনও চন্দ্র সূর্যের উদয় আর অস্ত-গমন বন্ধ হয় নাই।"

পারিবারিক হিংসায় শ্বশুর-শাশুড়ি কেউ কম যান না। শ্বশুর যেমন টাকার লোভে একের পর এক পুত্রবধূকে হত্যা করতে পারে শাশুড়ি তেমনি পুত্রবধূ বংশ রক্ষায় অসমর্থ হলে অর্থাৎ কন্যা সন্তান নয়, মৃত পুত্র সন্তান প্রসব করলে, তাহলে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে বলতে পারে—

"এ-বধূ যদি এখনই মৃত্যুমুখে পতিত হয় তবে সে কালীঘাটে যাইয়া মাকে যুগল ছাগের রক্ত দান করিবে।"

পারিবারিক হিংসার এই বিষ দাঁত ভাঙতেই প্রয়োজন হয় সমাজপতির। সামন্ততন্ত্রের এই রীতি অনুসারে স্ত্রী রক্ষায় ভুবনকে দিনপতি রায়ের স্মরণাপন্ন হতে হয়। গ্রামের মধ্যে এমন একটা অপরাধের প্রতিকারে দিনপতিকে পর্ব্বতের মত এসে দাঁড়াতেই হয়। কিন্তু জগদীশ গুপ্তের কাল সামন্ততন্ত্রের সুদিন নয়। থানা পুলিশের মত রাষ্ট্রশক্তি সমাজপতিদের থেকে শক্তি ধরে। কামিনীকে জব্দ করতে দিনপতিকে তাই পুলিশের ভয় দেখাতে হয়। পুলিশের ভয়ে কামিনী পার্ব্বতীর সেবা যত্ন করলেও তার কৃত্রিমতা ঢাকা দেওয়া যায় না। দক্ষবালা খবর পেয়ে মেয়েকে আনতে এলে কামিনী বাধা না দিয়ে চমৎকার অভিনয় করে—

"—তা নিয়ে যাও; কেউ তোমার পথ আগলে নাই। আমার বেটার বউ, তোমার পেটের মেয়ে; রক্তের টান তোমারই। নিয়ে যাও; তোমার কাছেই থাকবে ভাল— যত্ন আত্তি পাবে—"

কিন্তু— "তারপর বলিল—আমাদের তোমার বিশ্বাস হল না, বেয়ান। ভাবলে, বুঝি তোমার মেয়েকে আমরা ঠাঁই দিতে চাইনে, বুঝি মেরে ফেলতে বসেছিলাম। তা এখন ভাল হোক তোমার— বউকে ফিরিয়ে দিতে পারো ভালই, না পারো তো তাতেও দুঃখ নাই। —বলিয়া সে দাঁড়াইল না বাড়ির ভিতর চলিয়া আসিল।"

কামিনীর মনের নিষ্ঠুরতাকে, পরপীড়নের সুখকে জগদীশ গুপ্ত ঢেকে রাখতে চাননি।

কিন্তু গল্পটি প্রচলিত ভাবনাকে গুঁড়িয়ে দেয় পরবর্তী অংশে। যে পার্ব্বতীর স্বামীর প্রতি কোনো অভিযোগই ছিল না এমনকি শাশুড়িকে পর্যন্ত জানিয়ে গিয়েছিল— 'মা, আমায় খুব শিগ্‌গিরই নিয়ে এস।' সেই পার্ব্বতীকে ভুবনেশ্বর আনতে গেলে শুধু দক্ষবালা ও পার্ব্বতী তাকে ফিরিয়ে দেয়নি, পার্ব্বতী শাশুড়ির পাশাপাশি ভুবনেশ্বরের বিরুদ্ধেও তাকে

প্রহার করার অভিযোগ জানায়। হতবাক ভুবনেশ্বর ফিরে এলে মায়ের তীক্ষ্ণ শ্লেষের মুখে পড়তে হয়। অগত্যা আবার সেই দিনপতি রায়ের স্মরণ নেওয়া। দিনপতি কামিনীর আচরণের কথা ভেবে প্রথমত উদাসীন থাকে। কিন্তু স্ত্রী স্বামীকে ত্যাগ করেছে সেই লজ্জার হাত থেকে রক্ষা পেতে যখন ভুবনেশ্বর জানায়— 'তারা তোমার নাম শুনেছে' তখনই দিনপতি রায়ের আমিত্ব জেগে ওঠে ও ভুবনের শ্বশুর বাড়ি গিয়ে নিজের নামটার একটা চিহ্ন স্থাপনে মেতে ওঠেন। খণ্ডগ্রামের অধিপতির ধারণা ছিল না নিজের গ্রামে সে অধিশ্বর হলেও পাশের গ্রামের নিরীহ নারীর কাছে তার এমন দশা হবে। দক্ষবালা জামায়ের সঙ্গে কথোপকথনের মাঝে দিনপতির নাক গলানোকে এককথায় নাকচ করে দিয়ে অসম্মান করতে ছাড়ে না। অবশেষে ভুবনের শাশুড়ির বুদ্ধিমত্তার কাছে পরাজিত হয়ে কামিনীর মত তাকেও থানা পুলিশের ভয় দেখিয়ে আসে দিনপতি রায়। সমাজপতির ক্ষমতার অসারতা স্পষ্ট হয় দক্ষবালা গাঁয়ের কয়েকজনকে ডেকে পাঠানোর সংবাদ দিলে। কোর্টে অবশ্য দিনপতি তার ক্ষমতা দেখাতে সক্ষম হয়। মামলার অর্থ সংগ্রহ ছাড়া সব দায়িত্ব সে নিয়ে নেয় ভুবনের হাত থেকে। বিবাদী পক্ষকে পরাজিত করে দিনপতি উল্লসিত কারণ পার্ব্বতী একটু আগেই জানিয়েছে তার ও তার মায়ের অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। কিন্তু দিনপতির জয় সাময়িক, সমস্ত উল্লাস মাটি করে দেয় পার্ব্বতীই, পার্ব্বতী হেরে গিয়েও জর্জকে জানায় সে শ্বশুর বাড়ি যাবে না। কারণ— "অসুখের সময় ছেলে পেটে এসেছিল; মরতে বসেছিলাম। এ শরীরে আমি ছেলে চাইনে। ছেলে আমি পেটে ধরতে পারব না। রক্ষে করো আমাকে তোমরা।' বলিয়া পার্ব্বতী আবার ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।"

পুরুষশাসিত সমাজের চাপিয়ে দেওয়া আদর্শ বংশ রক্ষার একমাত্র কুলপ্রদীপ পুত্র সন্তান, সেই সন্তান ধারণ করতেই পুত্রবধূকে শ্বশুরালয়ে থাকতে হবে, এমন সামন্ততান্ত্রিক সংস্কারকে পার্ব্বতীর মত গ্রাম্য মেয়ে অস্বীকার করবে, তা শুধু জগদীশ গুপ্তই দেখাতে পারেন। কন্যা সন্তান নয়, পুত্র সন্তানই চাই; তা না হলেই পুত্রবধূকে আবার ঠেলে দেওয়া হবে মৃত্যুর দিকে। দিনপতি রায় ভুবনের স্ত্রীকে ফিরিয়ে দিয়ে পরিবারতন্ত্রের জয়কে আইনী স্বীকৃতি দিলেও পার্ব্বতীর কাছে তাঁকে হেরে যেতেই হয়েছে। কারণ নারী মনের উপর সমাজের চাপিয়ে দেওয়া সংস্কারের দীর্ঘকালীন অন্ধকার, ভয়, অবদমনের দুঃসহ বেদনা দূর করা সমাজপতির দ্বারা সম্ভব নয়। সমাজপতি পুরুষ প্রকৃতির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আদালতে পার্ব্বতীর 'ছেলে আমি পেটে ধরতে পারব না।' এক প্রতীকি ব্যঞ্জনা পেয়ে যায় এ গল্পে। দিনপতি রায় (পর্ব্বত) যদি সমাজ আদর্শের প্রতিভূ হয় ভুবনের স্ত্রী পার্ব্বতী তবে তাকে অস্বীকারের প্রতীক। জগদীশ গুপ্ত মানববিশ্বের সাজানো বাগান লণ্ডভণ্ড করে দিতে চান।

'তিনি যে পুরুষ,— পুত্রের পিতা, বধূর শ্বশুর, স্ত্রীর স্বামী, আর মনুষ্য সমাজে বাস করেন' — তাই পুত্রবধূ মায়া পুত্র অমৃতের ব্যাভীচারের প্রতিবাদ জানিয়ে যখন শ্বশুরের মুখের উপর বলে দেন— 'তিনি যেদিন ভাল হবেন, সেদিন এসে আমায় নিয়ে যাবেন,

তার পূর্বে নয়'— তখন অক্ষয়চন্দ্রের মতো ভালো মানুষটিও দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ঘোষণা করে বসেন— 'আবার বিয়ে দেব ছেলের।' পুরুষতন্ত্রের আর এক মুখোশ জগদীশ গুপ্ত উন্মোচন করেন 'পুত্র এবং পুত্রবধূ' গল্পে। ১৩৫২ সালে *'মাসিক বসুমতী'* পত্রিকায় গল্পটি প্রকাশিত হয়। সভ্যতার ইতিহাসে ধর্মতন্ত্র, রাজতন্ত্র, রাষ্ট্রতন্ত্র থেকে সমাজ ও পরিবারতন্ত্র সর্বত্র পুরুষতন্ত্রের দীর্ঘসূত্র আছে। পুত্রের অপরাধকে লঘু করে দেখা, পুত্রবধূর গুণপনা বিচারের পাশাপাশি সতীত্বের পরীক্ষা, অবলীলায় স্ত্রী পীড়নের আনন্দ বা স্যাডিজম্ সমাজে এসব দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। অনেক গল্পেই জগদীশ গুপ্ত পুরুষতন্ত্রের নানা কুটিল রূপকে এঁকেছেন। সবক্ষেত্রেই তাঁর কৃতিত্ব বাহ্য ঘটনার আড়ালে মনস্তত্ত্বের মানসকূটের বিশ্লেষণের দক্ষতায়। এ গল্পের অক্ষয়চন্দ্র আপাত পরিচয়ে ভাল মানুষ শুধু নয়, ভাল শ্বশুর। পুত্রবধূ মায়াকে কাছে পেয়ে স্নেহে, মমতায় আদর্শ গৃহবধূ করে তুলে কন্যাসন্তানের অভাব ভুলে যেতে চান। কিন্তু গল্পকার জগদীশ অক্ষয়চন্দ্রের মনের গহনে ডুব দিয়ে এই ভালমানুষিকে উপহাসের পাত্র করে তোলেন, যেন পাঠককে শোনাতে চান— 'বাঘ খাও হে ঘাস!' তা নইলে পুত্রে-র ব্যাভীচারকে পুত্রের জননী কল্যাণী মানতে পারেন না অথচ পিতা অক্ষয়চন্দ্র দোলাচলতায় নীরব থাকেন কেন। পুত্রবধূ না আসায় দুঃখিত হবার কোনো কারণ কল্যাণী দেখতে পান না। বরং একটা নিষ্কৃতির সুখেই তিনি মায়াকে আশীর্বাদ করেন। তাঁর মনে হয়, 'এ-হিসেবে বধূ ঠিক কাজই করিয়াছে— আসা তার উচিত হইত না। ... বধূ তাঁহাদিগের ত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগকে ধারণ করিয়া আছে। বধূ তার স্বামীকে, তাঁহাদের পুত্রকে ত্যাগ করিয়াছে— সমাজে অপাংক্তেয় হইবার ভয় তাহাতে নাই, যদি তাঁহাদিগকে অপাংক্তেয় করিবার বুদ্ধি সমাজের মস্তিষ্কে কখনো জাগ্রত হয় তবে তাহা পুত্রের ব্যবহারে অতিষ্ঠ হইয়াই হইবে, বধূর ব্যবহারে নয়। অতএব সতী মেয়ে চিরজীবিনী হোক।' অন্যদিকে অক্ষয়চন্দ্র পুত্রের আচরণের নিন্দা না করে বলেন— 'মানুষের ইয়ত্তা পাওয়া সত্যই কঠিন।' এই দোলাচলতার মধ্যে যেই অক্রূর অক্ষয়চন্দ্রকে অপমানসূচক মন্তব্য করেন— 'তোমার উচিত ছিল এমন ঘরে বিয়ে দেওয়া যারা কিছু বোঝে না, অনুভব করে না। — সমান ঘর মানে এ নয় যে, আর্থিক অবস্থা একই রকম— চরিত্রেরও প্রকর্ষগত সামঞ্জস্য থাকা চাই।' এই অপমানে অক্ষয়চন্দ্রের উক্তি— 'আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিও না।' এরপর পুত্রের পুনর্বিবাহের ঘোষণা প্রমাণ করে অক্ষয়চন্দ্রের কাছে পুত্র অমৃতের ব্যাভীচারের থেকে পুত্রবধূর শ্বশুর বাড়ি ফিরে না আসার শর্ত বড় অপরাধ। পুরুষতন্ত্রের এই মেকি ছদ্মরূপ সহজে চেনা যায় না।

পরের গল্পটির নাম 'অসংলগ্ন ভবিষ্যৎ' ১৩৫০ সালে *প্রবর্ত্তক* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। যে দৃশ্য সরোজাক্ষের চোখে পড়ে সে-দৃশ্য স্বপ্নেও সাংঘাতিক। দেখে স্ত্রী অংশুময়ী ও তার পুরাতন বন্ধু পঙ্কজ পরস্পরের দিকে ঝুঁকে আছে—

"পঙ্কজের বাঁ হাতখানা অংশুময়ীর গ্রীবা বেষ্টন করিয়া আছে— উভয়ে চুম্বনরত—

মাত্র একটি মুহূর্তের জন্য সরোজাক্ষের মনে হইল, ফিরিয়া যাই; পরক্ষণেই সে নিঃশব্দে প্রবেশ করিল...

পঙ্কজ আনত চক্ষে উঠিয়া দাঁড়াইল।

অংশুময়ী আনতচক্ষে বসিয়া পড়িল।

সরোজাক্ষ বলিল, কত সুখী হলাম তা বলতে পারিনে। বিয়ে করবার কিছুদিন পর থেকেই কেবল এই চিন্তায় আমার মনে তিলমাত্র শান্তি ছিল না: আমি আমার ঠিক মনের মতো করে স্ত্রীপালনের গুরুদায়িত্ব পালন করবো কি করে! ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখছিলাম। আমি নিষ্কৃতি পেয়েছি— অংশুময়ী আমার নয়, আপনার। আমার দায়িত্ব নেই।"

এক সাংঘাতিক দৃশ্যের এমন বিপরীত আরামদায়ক প্রতিক্রিয়া পাঠককে শুধু নর-নারীর আদিম সম্পর্কের মানসকূটের জটিলতা বিষয়ে ভাবায় না, পারিবারিক-সামাজিক আদর্শের দীর্ঘলালিত সংস্কারের ভিত্তিকেই নড়বড়ে করে দেয়। ত্রিকোণ সম্পর্কের বিষক্রিয়ায় হিংসার আগুন জ্বলে ওঠাই ছিল স্বাভাবিক। মনোবিকলনের স্বাভাবিক ধর্ম অনুসারে সরোজাক্ষ কর্তব্য পালনের হাত থেকে মুক্তি পেতে চাইলেও স্ত্রীর অন্য সম্পর্ক মেনে নিতে পারে না। বিশেষত যে সুন্দরী স্ত্রীর প্রেম ও রূপমোহ একদিন সরোজাক্ষকে অহংকার ও আনন্দে ভরিয়ে রাখত। এমনকি বিবাহের সময়ও অংশুময়ীর অনেক কৃপাপ্রার্থীকে পরাজিত করতে পেরে যে গর্ব অনুভব করেছে তার পক্ষে ঈর্ষা, ক্ষোভ, ঘৃণা প্রকাশই পাঠক প্রত্যাশা করে। জগদীশ সেই স্বাভাবিক পথে হাঁটেন নি। পাঠককে স্বস্তি দিয়ে আনুগত্য পাওয়ার প্রচেষ্টা না করে বরং পাঠককে অস্বস্তিতে ফেলেন জগদীশ। সরোজাক্ষ-অংশুময়ী বোধ হয় সমস্ত বিবাহিত নারী-পুরুষকেই আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির দ্বন্দ্বকে সামাজিক আদর্শের আড়ালে ঢেকে রাখা যায় না। সামন্ততান্ত্রিক সংস্কারের বশবর্তী হয়ে ভারতীয় সমাজ ভাবে পারিবারিক আদর্শের একটি স্তম্ভ বিবাহ। ফলত ভদ্রলোকের বিবাহিত জীবন কর্তব্য পালনের নিষ্ঠার নানা নিগড়ে বাঁধা পড়ে। সরোজাক্ষ বিবাহের আগে বিবাহিত জীবনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এতটা ভাবেনি। বিবাহের পরেই কর্তব্য পালনের ঠেলায় বুঝতে পারে অংশুময়ীর প্রেম অর্জন করেই তৃপ্ত থাকা উচিত ছিল, তাকে বিবাহের নিগড়ে বাঁধা ঠিক হয়নি। সরোজাক্ষ পরে হলেও বুঝতে সক্ষম হয়েছে যৌন-সুখ-সম্ভোগের যে সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা হিসাবে বিবাহকে আদর্শ সমাজ দেখে আসছে তা আসলে দীর্ঘলালিত সংস্কার বা এক ধরনের টাবু। এই সংস্কারকে স্বীকার করাই কঠিন তার উপর এই টাবু থেকে মুক্তির আনন্দ, যা সরোজাক্ষের মাধ্যমে জগদীশ পাঠককে দিতে চান তাকে সাদরে গ্রহণ করার মতো পাঠক তাঁর সমকালে কেন এই একবিংশ শতকেও বিরল।

অন্যদিকে অংশুময়ীও নিতান্ত ব্যক্তিগত ভাবনাকে মূঢ়ের মতো বিশ্বাস করতে করতে

তাকে এক সংস্কার বা টাবুতে পরিণত করেছিল। পঙ্কজ শিক্ষায়, মনের সূক্ষ্মতায় সরোজাক্ষ অপেক্ষা যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও অংশুময়ী বিবাহ করেছিল সরোজাক্ষকে, তার মনে দানা বেঁধেছিল দীর্ঘ বিশ্বাসের সংরক্ষিত টাবু। অংশুময়ীর ধারণা-সংসার করতে টাকা, আভিজাত্য বা বিলাসিতা লাগে না, লাগে সুখ শান্তি। সে ব্যাপারে মাঝারি মনের মাঝারি বুদ্ধির মানুষই ভাল। তাতেই সুখি হওয়া যাবে। এই বিশ্বাসকে অংশুময়ী যে টাবুতে পরিণত করেছিল তা বোঝা যায় তার অহংগর্বিত প্রকাশেই। এই সংস্কারকে ভাঙতে লেখক সামনে আনেন শিক্ষায় বাংলা ভাষা নাকি ইংরাজি ভাষাই শ্রেয় সরোজাক্ষ ও পঙ্কজের এই বিতর্ককে। সরোজাক্ষ ইংরাজির পক্ষ নিলেও পঙ্কজ অনুভূতির সূক্ষ্মতায় বাংলা ভাষার পক্ষ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের আপত্তির কথা তুললে অংশুময়ীও তাকে সমর্থন জানায়। এরপর সরোজাক্ষের সামান্য অনুপস্থিতিতে অংশুময়ী ও পঙ্কজের চুম্বনরত দৃশ্য সামান্য ঝটকা পাঠককে দিলেও তাদের মনের অভিন্নতা জগদীশ আগেই জানিয়ে রেখেছেন। জগদীশ গুপ্তের দক্ষতা মনোবিশ্লেষণের দ্বারা মানুষের তৈরি করা বিশ্বাস, আদর্শের অসারতাকে খোলা চোখে পাঠককে দেখানো; বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলাকে মানববিশ্বের ধ্বংসলীলায় প্রত্যক্ষ করা।

'অসংলগ্ন ভবিষ্যৎ'-এর সংলগ্ন গল্প 'মহিম সর্বাধিকারীর মন' ১৩৫৪ সালে *প্রবর্ত্তক* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এ গল্প পাঠককে শোনায়— স্বামী-স্ত্রীর যৌবন সুখ দুদিনের, অন্তরের উত্তাপ নিষ্প্রভ হয়ে গেলে বিবাহিত দম্পতি পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কন্যা ও জামাতার ভালবাসাকে দেখে মহিম সর্বাধিকারী খুঁজে পান মনের বিবর্তনের এই গতিপ্রকৃতি। স্নেহ, বাৎসল্য, ভালবাসা একটা প্রলেপ মাত্র জীবনের উপর। কর্তব্য পালন করতে করতে বয়স যতই বাড়ে, সম্পর্কের কাল যতই দীর্ঘ হয় ততই তার বাঁধন আলগা হয়ে পড়ে। কিন্তু সামাজিক পারিবারিক আদর্শে লালিত মন তাকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। সহজে মন বিবর্তনকে মানতে চায় না। জগদীশ মানববিশ্বের এই ছদ্ম আস্তরণ সরিয়ে দেন বলেই মহিম সর্বাধিকারী খুঁজে পায় ব্যক্তির মৌল সত্তাটিকে—

> "দু'দিন, মাত্র দু'দিন, যৌবন যখন তৃষার্ত হইয়া হাহাকার করিতে থাকে তখন, সেই তৃষার্ত অসহনীয় যৌবনের খোরাক হয় স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরে। প্রেমের আর কোনো অর্থ নাই। তাহার পর তাহা স্তিমিত নিশ্চল হইয়া অবলুপ্তির পথে নিমজ্জিত হইতে থাকে..."

দাম্পত্য জীবনের এই বিচ্ছিন্নতাকে জগদীশ চিরন্তন সত্য করে তোলেন কালিদাসের শকুন্তলার প্রতি দুর্বাসার অভিশাপের উপমায়। তাতে গল্পরস বিঘ্নিত হয় ঠিকই, কিন্তু গল্পরস অপেক্ষা জীবনের মৌল রূপের উন্মোচনই লেখকের উদ্দেশ্য। জগদীশ লেখেন—

> "দুর্বাসার সেই অভিসম্পাত ব্যাপকতর হইয়া এখনো কাজ করিতেছে বুঝি। অভিজ্ঞান চিরদিনের মতো হারাইয়া গেছে; দু'দিনের উত্তাল তরঙ্গের মাথায়

নাচিয়া স্ত্রী আর পুরুষ কোথায় ভাসিয়া যাইতেছে তাহার উদ্দেশ্য নাই; দেহ দেখা যায়, স্পর্শ করাও যায়, কিন্তু অপূর্ব আর উপভোগ্য কিছু থাকে না তাতে— অন্তরের উত্তাপ আর রাগশূন্য মৃত বস্তু সে— স্মৃতিচিহ্নের প্রয়োজনীয়তা মানুষ অনুভবই করে না।"

মহিম সর্বাধিকারীর শেষ কথা আমাদের তথাকথিত মানবাদর্শের সমস্ত খুঁটিই নাড়িয়ে দেয়—

"মনে হইল, কাহাকেও সে ভালবাসে না, নিজেকে নয়, স্ত্রীকে নয়, কন্যাকেও নয়।"

পাঁচ

তবে মানুষের তৈরি তথাকথিত মানববিশ্বের চরম পরিণতি ডেকে এনেছে ধনতান্ত্রিক বিশ্বের ধনতৃষ্ণা। সামন্ততন্ত্রে ঐশ্বর্য-ভোগবিলাসিতার ভয়ঙ্কর ক্ষুধা রাজপ্রসাদের সংকীর্ণ গণ্ডীতে হাহাকার করে মরেছে। দরিদ্রের জীর্ণ কুটিরে নিপীড়িত প্রজা রাজা-উজীর হওয়ার কথা ভাবলেও কেবল বেঁচে-বর্তে থাকতে চেয়েছে ঈশ্বরের কৃপায়। সমাজ পরিবার ধর্মের নীতি-উপদেশ মেনে সে জীবন গতানুগতিক প্রথা-সর্বস্বতাকেই মানববিশ্ব বলে মেনে নিয়েছিল। এই বিশ্বাসের শিকড় এত গভীরে প্রথিত যে, ধনতন্ত্রের যুগেও বহুদিন ব্যক্তি-পরিবার-সমাজ-ধর্ম তার জের টেনে চলেছে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে ধনতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদের হাত ধরে ধনবিশ্বের যে প্রবল পরিধি গড়ে তোলে তার প্রত্যক্ষ ফল যেমন যুদ্ধ তেমনি পরোক্ষ ফল ঘরে ঘরে ধনতৃষ্ণার হাহাকার। বাংলা ছোটোগল্পে প্রথম এই অর্থগৃধ্নু সমাজের নিষ্ঠুর পীড়নের প্রতিবাদ ধ্বনি শোনা গিয়েছিল নিরুপমার ('দেনাপাওনা') গলায়— 'আমি কি কেবল টাকার থলি।' পরবর্তী গল্পকারেরাও পারিবারিক সামাজিক গণ্ডীসীমায় ফেলে এই ধনতৃষ্ণার ভয়ঙ্কর পরিণতি ও নিষ্ঠুর হিংস্রতার চিত্র এঁকেছেন। কিন্তু জগদীশ গুপ্তের যে দুটি গল্পের কথা এবার আমরা বলবো তাতে প্রথাগত মানববিশ্ব শুধু ভেঙে পড়ে না, বোধহয় তার ছাইভস্মকেও জগদীশ ভাঙা-কুলোয় ঝেটিয়ে বিদায় করতে চান।

'অর্থ পিশাচ' কথাটা নতুন কিছু নয়। ধনলোভ-ধনতৃষ্ণা ব্যক্তিবিশেষে সর্বগ্রাসী রূপ নিতে দেখা যায়। সঙ্গ-আসঙ্গে জড়িয়ে অর্থ প্রবল মোহ-বাসনায় ধনপিপাসুর মনকে বেঁধে ফেলতে পারে। তা থেকেই আসে কৃপণতা। কৃপণতা আত্মহননের মত কৃচ্ছসাধনেও মনকে প্ররোচিত করতে পারে আবার নৃশংস হিংস্র দানবীয় কর্মেও প্ররোচনা দিতে পারে। সংসারে পরিবারে এই হিংসার বলির বাজনা নিরন্তর বাজলেও তার সুর সচরাচর বলির আগে প্রতিবেশীর গোচরে আসে না। সর্বত্রই ধনপিপাসু সরল মানবিক আচরণের মায়বি বিভ্রমের জাল বিস্তার করে রাখে। এদের নানা টাইপের কথা গল্প উপন্যাসে তুলে ধরা হয়।

কিন্তু একটি মাত্র গল্পে কৃপণতার, পৈশাচিকতার ধারাবাহিক উল্লাসের নির্মমতা-নিষ্ঠুরতার অমানুষিক ভয়ঙ্করতার দুর্বিষহ ছবি কেবল জগদীশ গুপ্তই আঁকতে পারেন। অর্থ হারানোর আশঙ্কায় কৃপণ ব্যক্তিটি সদা-সর্বদা দুর্ভাবনায় অস্থির হয়েও সতর্ক অভিনয়কুশলী। আমরা বলতে চাচ্ছি 'মায়ের মৃত্যুর দিনে' গল্পটির কথা। কেশবলাল দত্ত সর্বদা ছটপট করে বেড়ায়। কিন্তু সেই অস্থিরতা বিষাক্ত হয়ে ওঠে যখন কোনো কাজে অর্থের প্রয়োজন হয়। সংসারে সব ব্যাপারেই অর্থ। তাই কেশবলালের ছটপটানি থামতে চায় না। দুধের দাম বাড়লে, চাকর-বাকরেরা মাহিনা চাইলে, ছেলে স্কুলের মাহিনা চাইলে কেশবলাল শুধু ক্রুদ্ধ হয় না, এক একটি ক্ষেত্রে রাগের বহিঃপ্রকাশ একেক রকম। এতগুলো টাকা মিছামিছি জলে গেল— একথা কখনো ভুলতে পারে না। সংসারে এমন কৃপণ মানুষ দুর্লভ নয়। কন্যাদান করতে গিয়েও অনেক অর্থ তাকে গচ্চা দিতে হয়েছে। সকলেই কিছু না কিছু বেশি নিয়ে তাকে পীড়ন করেছে এই অভিযোগের পাশাপাশি এত খরচ কেবল সে-ই করতে পারে এমন অহংকার করতেও ছাড়ে না। কিন্তু কথক পাঠককে সর্বদা জানাচ্ছেন এই অস্থিরতা গুলো কিছুই নয়। আমরাও বলতে পারি যেকোনো কৃপণ ব্যক্তির পক্ষে এমন আচরণ সঙ্গত।

কিন্তু জগদীশ মানুষের দুর্বৃত্তি কতদূর যেতে পারে তা জানেন। জানেন 'অর্থ পিশাচ' মনের বিচিত্রসব জটিল গতিপ্রকৃতি। তাই দেখা যায় অর্থ ক্ষতি ভুলতে না পেরে কেশবলাল পণপ্রথা প্রচলনকারীকেও গালি দিতে ছাড়ে না; বিয়ে বাড়িতে গলা ভর্তি খেয়ে যারা ঢেকুর তুলতে তুলতে বাড়ি ফেরে তাদেরকেও কেশবলাল মনে মনে গালি দেয়— ধীরে ধীরে কথক পাঠকের সহনশীলতাকে আঘাত করতে শুরু করেন। এরপর কেশবলালের একের পর এক মানববিশ্বকে বিসর্জন দেওয়ার কাহিনি শোনাবেন জগদীশ। প্রথম আঘাতটি আসে নির্মম পিতার রূপ ধরে। বড়ো কন্যার বিবাহের ক্ষতিপূরণ হতে না হতেই ছোটোমেয়ে তরতর করে বেড়ে উঠছে, তাই পিতা কেশবলাল আর মেয়ের দিকে ফিরেও তাকায় না। জগদীশ লেখেন—

> "আর একটি মেয়ে, সুলোচনা, দ্রুতবেগে বড় হইতেছে। রাগ আর সহ্য হয় না বলিয়া কেশবলাল সুলোচনার দিকে তাকায় না।"

কৃপণ পিতা অপেক্ষা কৃপণ পুত্র আরও নৃশংস। সন্তানের হাতে বাবা-মায়ের পীড়ন (যদি সে বাবা-মায়ের সঞ্চিত অর্থ বা সোনাদানা থাকে তবে) তাও নতুন কিছু নয়। ইদানিং এই একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বাবা-মা-কাকি-খুড়ি-মাসি-পিসি শ্বশুর-শাশুড়ি বা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনদের নির্যাতন করা এমনকি খুন এক প্রকার ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু জগদীশ গুপ্ত গল্পটি লিখছেন প্রায় সাত দশক আগে। পরাধীন দেশে দেশমাতৃকার জন্য আত্মবলিদানের মহিমা তখন সর্বত্র প্রচারিত হচ্ছে। ঘরে ঘরে পিতা-মাতার সম্পত্তি নিয়ে অশান্তি মারামারি থাকলেও অসুস্থ মা সাবাড়ে ভাত খেলে ক্ষতি ছিল না, ফলের রস

খায়— এই নিয়ে ছেলের ছটপাটানি পাঠকের মনকে একটু একটু করে বিস্মিত করে। জগদীশ অবশ্য জানিয়ে দেন এই আচরণ তেমন কিছু নয়, কেশবলাল এইটুকু কারণেই অস্থির নয়। তার অস্থিরতার কারণ অন্য।

কেশবলাল ও রামলাল দুই ভাই। রামলাল পশ্চিমের এক শহরে স্ত্রী সুরবালাকে নিয়ে বাস করে। বৃদ্ধা অসুস্থ মা মৃত্যুর আগে ছোটো ছেলেকে দেখে যাবার সাধ করেছেন—

> "রামলালের আজও দেখা নাই— ছোটো ছেলে রামলাল এবং ছোটো বউ সুরবালাকে দেখিবার জন্য তাঁহার মাতৃ-হৃদয় ব্যথিত ব্যাকুল হইয়া আছে... ক্ষণে ক্ষণে জিজ্ঞাসা করিতেছেন : ওরা এল রে?"

মায়ের এ জিজ্ঞাসা কেশবলালকে এতটা উদ্বিগ্ন করেছে যে, তার উদ্বিগ্নতার কারণ স্ত্রী ও কন্যাকে জানিয়ে তাদেরকেও উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। এখানেই কেশবলাল একজন খুনির থেকেও ভয়ানক। সম্পত্তির লোভে মাকে খুন করেছেন— এমনটা ঘটলে মানববিশ্ব ভেঙে পড়ে না। এমন অপরাধ সব সমাজেই সংঘটিত হয়। এমনকি 'পয়োমুখমে্' কৃষ্ণকান্ত যেভাবে গোপনে গোপনে একের পর এক পুত্রবধূদের হত্যা করেছে তেমন ঘটলেও সে অপরাধ হত এক রকম। কিন্তু কেশবালালের অন্তর্জালিক মনকে দিয়ে লেখক আরও বৃহৎ-ক্রাইমের সন্ধান দিতে চান পাঠককে। কারণ কেশবলাল তার ধনতৃষ্ণার নিষ্ঠুরতার সঙ্গে, অতি সতর্কতায় ভাই রামলাল এসে পৌছানোর আগে মাকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দিতে তার যে সূক্ষ্ম পরিকল্পনা, সেই পরিকল্পনার সঙ্গে স্ত্রী ও কন্যাকে যুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। জগদীশ অবশ্য একে ক্রাইম স্টোরি বলবেন না। তাঁর সাহিত্যের জগতে মানব প্রকৃতির নিরাভরণ প্রকাশই মূলকথা। মানবমনের নিগূঢ়চেতনের স্বাভাবিক গতির অনুসন্ধানে তিনি অক্লান্ত উৎসাহী। তাঁর পাঠককেও হতে হবে তাই। অর্থাৎ ক্রাইম নয়, অর্থ রক্ষা। মায়ের সুস্থ অবস্থায় তাঁর যে সমস্ত সঞ্চিত গহনা অনেক চেষ্টা করেও মায়ের জিদ ও সতর্কতার জন্য হস্তগত করতে পারেনি মায়ের অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে তাকে হাতিয়ে নিতে কেশবলালের মানসিক ক্রিয়ার তৎপরতা ও তার সর্পিল গতিকেই জগদীশ দেখাতে চান। পাঠককে নিয়ে যেতে চান মানব মনের আদিম অরণ্যে। যে অরণ্যে ভাই, বোন, স্ত্রী, পুত্র, আত্মার আত্মীয় কেউ নয়। কেশবলাল কোনো মানসিক বিকারের শিকার নয়। যে গহনার প্রতি তার দীর্ঘ দিনের লোভ, হাতে না পেলেও যার ভাগ সে আর কাউকেই দিতে পারবে না তার জন্য তার কাছে কোনো আচরণই অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না। শেষবারের মতো ভাইকে মায়ের মুখ দেখতেও সে দেবে না। মা নাতিকে দিয়ে রামলালকে এসে দেখে যাবার অনুরোধ চিঠিতে জানালে কেশবলাল ভাইকে পাল্টা চিঠি লিখে জানায়—

> "মায়ের অসুখ হইয়াছে; বেশি কিছু নয়; তবে তাহার ধারণা জান্মিয়াছে, এ-যাত্রায় তিনি বাঁচিবেন না। তোমার সঙ্গে দেখা হয়, ইহাই তাহার ইচ্ছা; কিন্তু

আমার মনে হয়, চাকরির অসুবিধা ঘটাইয়া তোমার তাড়াতাড়ি করিবার কিছু মাত্র দরকার নাই। আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ যদিই আমরা তাঁহাকে হারাই তবে সেদিনের বিলম্ব আছে। তুমি বিশেষ ব্যস্ত হইবে না। কবিরাজ বলিয়াছেন, এ-যাত্রা বাঁচিলেও বাঁচিতে পারেন।"

মৃত্যুমুখীন মায়ের কাছে ভায়ের নামে বারবার অভিযোগ জানিয়ে ছদ্ম মানবিকতার আশ্রয় নিয়ে কৌশলে মাকে ব্যথিত করে তাঁর মৃত্যু ত্বরান্বিত করাই কেশবলালের উদ্দেশ্য। কেশবলাল জানায়—

"ওরা তো এল না। তুমি ভারি কষ্ট পেলে মা। ওরা তোমায় ভারি কষ্ট দিলে।"

এরপর ভাই পরের দিনই আসছে— এই টেলিগ্রাম আসায় কেশবলাল উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ে। কবিরাজ বন্ধুকে ডেকে আনা, তাকে করা কেশবলালের প্রশ্ন তথাকথিত মানববিশ্বকে আতঙ্কিত করে তোলে—

"কেশবলাল কৌশলে জানিতে চায়, মায়ের প্রাণবায়ু কেন নির্গত হইতেছে না। যে প্রাণ নির্গমোন্মুখ হইয়া আছে, আর নির্গত হইয়া যাইবেই, সে অযথা আবদ্ধ কেন আছে এবং আরও কতক্ষণ থাকিতে পারে, অধীর হইয়া তাহা জানিতে চাওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব কিনা জানি না, জানিতে চাওয়া পাপ কিনা তাহাও জানি না; কিন্তু এক্ষেত্রে সত্য কথা তাহাই।"

অর্থাৎ কেশবলালের ক্ষেত্রে যা সত্য মানুষের পক্ষে তা সম্ভব কিনা সে সন্দেহে পড়েছেন লেখকও। কিন্তু এই সত্য মনের নিষ্ঠুরতা সন্ধানে জগদীশ কিছুতেই থামতে পারেন না। মৃত্যুর আগে মা স্পষ্ট ভাষায় বারবার 'রামের অর্ধেক, তোমার অর্ধেক।' জানালেও কেশবলাল হার মানে না। নাতির প্রসঙ্গ তুলে, নাত বৌয়ের প্রসঙ্গ তুলে মায়ের কাছে গয়নার প্রার্থনা জানায়। অনড় মায়ের জিদ দেখে কেশবলাল এবার কবিরাজকে মায়ের নাড়ি দেখার অনুরোধ করে, বাহ্যভঙ্গিটি এরকম— ভাইটা মাকে দেখতে পাবে কিনা। কিন্তু কেশবলালের ক্রুর মনের উল্লাস ব্যক্ত হয় তখন যখন কবিরাজ জানান— 'আজ রাত কাটে কি না সন্দেহ...।' বন্ধু বলে যে কবিরাজকে এতদিন মায়ের চিকিৎসার জন্য কোনো পয়সা দেয়নি আনন্দে সেই কবিরাজকে কেশবলালের চারটি টাকা ভিজিট দিয়ে পুরস্কৃত করতে ইচ্ছে করে। যদিও তা সে দেয়নি। মায়ের মৃত্যুর অপেক্ষায় বসে থাকা কেশবলালের উৎকণ্ঠা প্রসঙ্গে বলতে হয়, মানুষের পক্ষে তা সম্ভব কিনা বলা যাবে না, কিন্তু কেশবলালের পক্ষে সম্ভব। অসাধারণ বিবরণ দেন জগদীশ গুপ্ত—

"সময় নিঃশব্দে বহিতে লাগিল। কৃষ্ণ পক্ষের রাত্রি গভীর হইয়া উঠিতেছে। অন্ধকার নিবারণের জন্য কেশবলাল, অতিরিক্ত ব্যয় হইতেছে জানিয়াও অনেকগুলি লণ্ঠন জ্বালিয়া, আর লণ্ঠনের তেজ যথাসম্ভব বাড়াইয়া দিয়া সমস্ত বাড়ি আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। ...মায়ের নিঃশ্বাস নাভি-আশ্রয় ত্যাগ করিয়া

ঊর্ধ্বগামী হইতেছে— স্পষ্টই তাহা দেখা যাইতেছে। মা একবার হাত তুলিয়া কি একটা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন— তৎক্ষণাৎ তাহা অনুমান করা গেল; তিনি বাহিরের দিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন।

তখনই চক্ষের পলকে নিঃশ্বাস-স্পন্দন কণ্ঠে উঠিয়া আসিল; কেশবলাল হাঁকিল, নিত্য।

নিত্য ও বিরামবাবু দৌড়াইয়া আসিলেন। 'ধর ধর' করিয়া কেশবলাল মায়ের মাথার নীচে হাত দিল; তিনজনে তাহাকে শূন্যে তুলিয়া বহন করিয়া লইয়া চলিল... বহন করিয়া আনিতে আনিতে বাহকগণের হাতের উপরই মায়ের শেষ-নিঃশ্বাস নির্গত হইয়া গেল।"

আমাদের শেষ আলোচ্য গল্প 'পামর' ১৩৪১ সালে *বঙ্গলক্ষ্মী* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এ গল্পের তমালকৃষ্ণ, যার নাম শুনলে নবদূর্বাদল শ্যামের কথা মনে পড়বে। অর্থাৎ কৃষ্ণরূপী নারায়ণ; সামন্ততান্ত্রিক ভাবাদর্শের দেবতা রূপে কল্পিত। তিনি কখনো রামচন্দ্র রূপে পিতৃসত্য পালনে বনে গেছেন কখনো ঐ তমালকৃষ্ণ, প্রেম-সৌন্দর্যের লীলারূপধারী ও কংসাসুর বধকারী রক্ষক। লেখক জগদীশের কথায় (একালে) এতটা ভাবা না গেলেও মানুষটি সুশ্রী, বিনত, স্নিগ্ধ বলে মনে হতেই পারে। কিন্তু তমালকৃষ্ণ তাও নয়। লোকচরিত্র জ্ঞানের সাধারণ মাপকাঠিতেও তাকে মাপা যায় না। কারণ দৈহিকভাবে তমালকৃষ্ণ দীর্ঘ নয়, যে তাকে বোকা ভাবা যাবে আবার খর্বও নয়, যে ধূর্ত ভাবা যাবে। আধুনিক কথাকার তাই পাঠককে ধরিয়ে দেন মনই হল আসল বস্তু। তমালকৃষ্ণের মনস্তত্ত্বের দিকেই পাঠককে ঠেলে দেন জগদীশ। তমাল মানসিক আলস্যে পরিপূর্ণ। পিতা রাজীবলোচনের চেষ্টা সত্ত্বেও স্কুল, শিক্ষক, বই কোনো কিছুর সঙ্গেই তার প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। তবে তার মানসিক সংরূপের এক প্রতীকি চিত্র জগদীশ এঁকেছেন, যা তাৎপর্যপূর্ণ—

"তমাল অর্থ উপার্জন করে না, কিন্তু সময়ে সময়ে তার মনে হয়, সে একটি কৃষ্ণবর্ণ বৃক্ষ। পল্লীবধূকে স্মরণ করিয়া সে মৃদুস্বরে গান করে; 'তমাল কালো, কৃষ্ণ কালো, তাইতে তমাল ভালবাসি; মরিলে তুলিয়া রেখ তমালেরই ডালে!' তাহার শাখা প্রশাখা বাহির হইয়াছে, এবং তাহার উপর চম্পকবরণী তরুণীর মৃতদেহ রক্ষিত হইয়াছে কল্পনা করিয়া তমাল মনে মনে খুব হাসে।"

তবে কি তমাল মানসিক ভাবে প্রেমের (মানবাদর্শের) মৃতদেহ বহন করে আনন্দ পায়! বস্তুত তমাল প্রেমিক নয়, কামুক। স্ত্রী মাধবীর উল্লাসিত দেহের দিকে চেয়ে তার উক্তি—

'তুমি আমার যমুনা; তোমার বুকে আমার ছায়া পড়েছে। ঐ দেখ মেঘ উঠ্‌ছে— কদম্বকাননে ঝড় উঠবে।' পরিবারের কারো প্রতি তমালকৃষ্ণের তেমন কোনো স্নেহ-ভালবাসার চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ সৎ পিতার আদর্শ ও মায়ের অগাধ স্নেহ-ভালবাসার পরিবেশেই তার বেড়ে ওঠা। এমন পরিবেশেই তো এতদিন শিক্ষা,

দীক্ষা, শিষ্টাচার, শোভনতা, সংযম, বিনয়, সততা ইত্যাদি মানবাদর্শগুলি বিকশিত হয়েছে। তাই রাজীবলোচনের পক্ষে তমালের মানসিক তামসিকতার কথা ভাবা সহজ নয়। লেখক লেখেন— 'কিন্তু এসব কথা রাজীব জানিতেন না; জানিলে আরও ব্যথিত হইতেন।'

বস্তুত তমাল নয়, তমালের মনটাই এখানে 'পামর'। এই মন সকলকে প্রত্যাশা দিয়ে প্রতারণা করে। রাজীবলোচনের অবসরের পর পরিবারের সকলেই যখন তার দিকে তাকিয়ে তখন মানসিক আলস্যে প্রথমত তমাল নির্বিকার, পরে সকলের তাড়নায় মিথ্যা প্রত্যাশা দিয়ে মা, বোন, স্ত্রী, বাবা সকলের সঙ্গেই সে প্রতারণা শুরু করে। মিথ্যা আশ্বাস ধরা পড়ে গেলেও তমাল ভুল শুধরে নেওয়ার কথা বলে তাকে ঢেকে দেবার চেষ্টা করে। পরিবারের সকলের সঙ্গে তমালের দ্বন্দ্ব বেধে গেলেও শেষমেষ দ্বন্দ্বটা এসে দাঁড়ায় বাবা রাজীবলোচনের সঙ্গে।

রাজীবলোচন ও তমালকৃষ্ণের দ্বন্দ্ব শুধু পিতা ও পুত্রের দ্বন্দ্ব নয় এ গল্পে। রাজীব মানববিশ্বের যে সমস্ত ভাবাদর্শকে জীবন সত্য বলে স্বীকার করেন তমাল তা করে না, বা মানসিক ভাবেই তার ভার বহনে অক্ষম। এ গল্পও আসলে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের গল্প। সামন্ততন্ত্র যে সমস্ত মানবাদর্শের জন্ম দিয়েছিল উনিশ শতকের রেনেসাঁর আঘাতে তার অনেক ধারণার, বিশেষ করে ধর্মীয়, সামাজিক ক্ষেত্রে কিছু রদবদল ঘটলেও বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত তার চরম পরিণতির আভাস পাওয়া যায়নি। মানসকূটের যে নতুনভাষ্য জগদীশ পাঠকের সামনে উপস্থিত করেন তার নগ্ন নিষ্ঠুর রূপ ফুটে ওঠে তমালকৃষ্ণের মধ্যে।

তমাল অবলীলায় মিথ্যা কথা বলে। ধরা পড়ে গেলেও তার অনুশোচনা থাকে না। বাবার পেনশনের টাকায় সংসার চলে না। সকলে তাকে অর্থ উপার্জনের কথা বললে এমন ভাব দেখায় যেন এসব ভাবনা অন্য কারো করার দরকার নেই, সে সব বুঝে নেবে। আর অতিরিক্ত চাপ দিলে কাউকে অপমান করতে তার বাধে না। ছেলের আচরণে মা, বাবা বিরক্ত হলেও নীরবে আঘাত সহ্য করেন। সংসারের ধার-দেনা বেড়েই চলে। স্ত্রী মাধবী অভাবের কথা তুললে তমাল অবলীলায় বাবাকেই অভাবের জন্য দায়ী করে বলে, বাবা তার জন্য কিছু করে রাখেনি। তার পরেও মাধবী নিজেদের খরচ নিজেদের করার কথা তুললে 'পামর' তমাল স্ত্রীকে চূড়ান্ত অপমান করে—

> "এঃ, বড়ই নাছোড়বান্দা দেখছি। মেয়ে মানুষের পক্ষে পয়সা রোজগার করা যত সহজ, পুরুষের পক্ষে তা নয়। তার শুধু রূপ থাকলেই হয় না।"

তমালকৃষ্ণের মানসকূটের নগ্ন সত্যকে ধীরে ধীরে উন্মোচিত করেন জগদীশ। ছেলের মিথ্যাচারে লজ্জিত রাজীব তমালকে ভৎর্সনা করলেও তমাল তা গায়ে মাখে না। বরং নিজের মত যুক্তি দিয়ে বলে—

"অবস্থা যখন স্বচ্ছল ছিল তখন ধর্মপথে থাকতে কোনো বিঘ্ন ছিল না; কিন্তু অভাবে স্বভাব নষ্ট একটু হবেই। পরে শুধরে নিলে চলবে।"

এরপরেই দেখা যায় তমাল দু তিন ঘণ্টা অনুপস্থিতির পর মায়ের হাতে পাঁচ টাকা এনে দিয়ে বলে—

"পয়সা ছড়ানো রয়েছে, মা; একটু বুদ্ধি খরচ করলেই পয়সা এসে যায়।"

রাজীবের মনে সন্দেহ, ভেবেছেন নিশ্চয়ই স্ত্রীর গয়না বেচেছে। কিন্তু মাধবী জানায় তমাল গয়না নেয়নি। কিন্তু কৌতূহল মাধবীরও কিছু কম নয়। রাত্রে মাধবীর জিজ্ঞাসায় তমালের উত্তরের ধরন যে হেঁয়ালি তৈরি করে তাকে মাধবী বুঝতে না পারলেও জগদীশ পাঠককে অবাক করে দেন; বুঝিয়ে দেন তমালের মানসকূট কোন কূটিল পথের দিকে এগিয়ে চলেছে। মানববিশ্বের ছাইভস্মও তমাল রাখবে না, টাকার রহস্য সম্পর্কে সে স্ত্রীকে জানায়—

"আনছিই ত। সবাই বলছ টাকা আনো, টাকা আনো— তাই আনছি। মানুষের বাবা বেঁচে থাকতে টাকার অভাব কি।

—তার মানে কি বুঝলাম না।

মানে, বাবা ত কারুর চিরকাল বেঁচে থাকে না, সক্ষমও থাকে না; কিন্তু ছেলেদের ভাত কাপড়ের দায়ী তিনিই। আমি বাবার পরবার কাপড় এনে দিয়েছি বটে, কিন্তু"

ব্যাপারটা স্পষ্ট হয় রাজীবের ছেলেবেলার বন্ধু হঠাৎ দেখা করতে এলে। রাজীব এসে দরজা খুলতেই চমকে ওঠে ত্রৈলোক্য রায়। ত্রৈলোক্যের প্রশ্ন— 'তমালের মুখে শুনেছিলাম, তুমি খুব অসুস্থ'। রাজীবের প্রশ্ন— 'কিছু নিয়েছে'? 'উত্তর যথারীতি হ্যাঁ, আরো অনেকের কাছ থেকেই নিয়েছে। তমাল বাবার আদর্শকে মূলধন করে, তাঁর অসুস্থতার মিথ্যা খবর ছড়িয়ে, চিকিৎসার নাম করে বাবার পরিচিতদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে। এজন্য তাকে এতটুকুও কুণ্ঠিত হতে হয়নি, কারণ সে মনে করে সংসারের ভাত কাপড়ের অভাবের জন্য 'বাবারাই দায়ী'। বস্তুত তমাল শুধু বাবাকে ছোটো করেনি, লজ্জিত করেনি, তার সুনাম বিক্রি করেও ক্ষান্ত হয়নি, যেন তাঁর সততার আদর্শকেই দায়ী করেছে। অবস্থা বুঝে একটু স্বভাব নষ্ট করলে রাজীবলোচন কি সন্তানের জন্য কিছু ধনৈশ্বর্য করে রাখতে পারতেন না! তা করেননি বলেই তাঁর সততা বেচে তমালকে ভাত কাপড়ের আয়োজন করতে হয়।

রাজীবলোচনের বুঝতে বাকি থাকে না, কু-পুত্রের মত শত্রু নেই। মান সম্ভ্রম কেড়ে নিয়ে এই পুত্রই তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কিন্তু একথা জানিয়েও তমালের কু-কীর্তিকে থামানো যায়নি। এক জনের ঋণ পরিশোধ করতে অপর জনের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে চলেছে। তমালের মনোভাব প্রসঙ্গে লেখক জানান—

"ঋণ গ্রহণ করিতেছে ইহাই স্থির করিয়া সে ত্রৈলোক্য রায় প্রভৃতি হিতৈষী

লোকের নিকট হইতে টাকা লইয়াছে, কারণ আজকালকার লোকগুলি অতিশয় সংকীর্ণ প্রকৃতির বলিয়াই টাকা বাহির করিতে চাহে না।'"

স্পষ্টতই তমাল শুধু বাবার সততা নষ্ট করছে না, লোকহিতৈষণার আদর্শ যাঁরা রক্ষা করে চলেছেন সেই পুরাতন প্রজন্মকেই বিকিয়ে দিতে চাইছে। গত প্রজন্মের বুকে শরাঘাত করেও অনুতাপ তমালের জাগে না। নিজেকে শুধরে নেবার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে মাত্র। কিন্তু সেই অস্ত্রও একদিন ভোঁতা হয়। সর্বংসহা মাও একদিন তমালকে জানিয়ে দেন— 'এ বংশে কাহারও জুয়াচোর নাম ছিল না— কুলে সে কলঙ্ক দিয়েছে।' পরিবারের সকলকে মুহ্যমান দেখে তমাল ক্ষণিক অপ্রতিভ হলে গল্পকার লেখেন—

"সেইদিনটা এবং আরো অনেকগুলি দিন উহাদের বড় নিরানন্দে কাটিল— যেমন নিরানন্দে কাটিয়াছিল অযোধ্যার, রাম বনবাসে গেলে।"

এ যুগের তমালকৃষ্ণ সামাজিক কিংবা পারিবারিক আদর্শ বহনকারী রামচন্দ্র নয়, সমস্ত মানবিক আদর্শকেই সে বনবাসে পাঠিয়েছে। তবু বাবা মায়ের মনে সন্তানের জন্য যেটুকু প্রত্যাশা অবশিষ্ট ছিল, তমাল একদিন নিজেকে শুধরে নেবে— সেই বিশ্বাসটুকুও যখন হারিয়ে যায়, মানববিশ্বের ছাইভস্মটুকুও থাকে না তখন এই নিরানন্দ, তামসিক অন্ধকারই সত্য হয়ে ওঠে। কিন্তু অন্ধকার থেকে কোনো আলোর উৎসের সন্ধান জগদীশ পাঠককে দেন না।

এই নির্মোহ কথাকার মানব মনের নিগূঢ় সত্যের উন্মোচনে পাঠকের প্রত্যাশার সঙ্গে কোনো আপোসেই রাজি নন। তাই 'পামর' গল্পের পরিণতি আদর্শের বিচ্যুতির আঘাতেই শেষ হয়ে যায় না। কয়েক দিনের জন্য উধাও হয়ে যায় তমালকৃষ্ণ। স্ত্রীর অসুস্থতায় রাজীবের অনূঢ়া কন্যার বিবাহের জন্য সঞ্চিত কপর্দকটুকুও যখন নিঃশেষিত তখন আসে তমালের পাঠানো মানিঅর্ডারের দশ টাকা ও চাকুরির খবর। নিরানন্দ গৃহে ক্ষণিক আনন্দের আলোক-তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়লেও রাজীব লোচন সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারেন না। দুরাচারী কু-পুত্র আরো কি দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে, আসন্ন বজ্রাঘাত কোনদিক থেকে নেমে আসতে পারে ভেবে উদ্বিগ্ন হলেও রাজীবলোচন ভাবতেও পারেননি পুত্র তার মৃত্যু ঘোষণা করে অর্থ সংগ্রহ করবে। জনকল্যাণ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন পড়ে রাজীবলোচন স্তম্ভিত। পত্রিকায় লেখা হয়েছে—

"শোক-সংবাদ! আমরা অতিব দুঃখের সহিত এই শোক-সংবাদ পত্রস্থ করিতেছি। অত্রস্থ মুনসেফী আদালতের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী শ্রীযুক্ত রাজীবলোচন বসু মহাশয় আর ইহজগতে নাই। গত ১৬ই বৈশাখ তারিখে তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।... আরও শোচনীয় বিষয় এই যে, তিনি এক কপর্দকও রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। কিছু ঋণ আছে। কনিষ্ঠা কন্যাটি এখনও অনূঢ়া। তাঁহার শ্রাদ্ধের ব্যয়

নির্বাহার্থে সাহায্যপ্রার্থী হইয়া তাঁহার পুত্র শ্রীমান তমালকৃষ্ণ এখানে আসিয়াছেন। আমরা শুনিয়া তৃপ্তিলাভ করিলাম যে, প্রসেস্-সার্ভারগণ, আমলাবর্গ, উকীল, মহুরী প্রভৃতি সচেষ্ট হইয়া পরলোকগত বসু মহাশয়ের শ্রাদ্ধের ব্যয়ের জন্য শতাধিক টাকা চাঁদা তুলিয়া শ্রীমান তমালকৃষ্ণের হস্তে অর্পন করিয়াছেন।"

ছয়

জগদীশ গুপ্তের অন্তর্ভেদী দৃষ্টিকে সমকাল গ্রহণ করতে পারেনি। রাজীবলোচন যেভাবে বিষ যন্ত্রণায় জর্জরিত হয়ে পালিয়ে বেঁচেছেন, জগদীশের পাঠকও সেকালে পালিয়ে বেঁচেছেন। কিন্তু বর্তমানে ট্রেনে-বাসে, অফিসে-ঘরে, এমনকি গ্রামজীবনেও সর্বত্র কানে আসে— সততা দিয়ে, আদর্শ দিয়ে, ভাল রেজাল্ট দিয়ে, ভাল মানুষ হয়ে কিস্‌সু হয় না। ধান্দা করতে হয়, ধান্দা জানা চাই। কি পরিশ্রম করেছ, কোথা থেকে এল, এসব জানার প্রয়োজন নেই। টাকা ঘরে এলেই হল। টাকার জন্য কেউ কাউকে ছাড়ে না। —তখন মনে হয় জগদীশের তমালকৃষ্ণ ('পামর') এখন ঘরে ঘরে। ঘরে ঘরে তমালকৃষ্ণের চাষ করে চলেছি আমরা। এরাই আমাদের পরিবার, সমাজ, রাজ্য থেকে রাষ্ট্রের চালক। যদি তমালকৃষ্ণের মানসকূট সার্বিক সত্য নাও হয় তবু এই সত্যকে না জেনে মানবিক সমাজ গঠনের ভাবনা রক্ষা করাও কঠিন। কদিন আগেও মার্কসীয় সাহিত্য কথাটা যে বিশ্বস্থতায় উচ্চারিত হত এখনি সে উৎসাহে ভাঁটা পড়েছে। সাহিত্য যদি মানব মনের গভীর তলে স্বতন্ত্র অভিসারে নিবিষ্ট না হয় তবে তাকে কোনো আদর্শ দিয়ে জিইয়ে রাখা যাবে না। জগদীশ তাঁর মৌলিক সাহিত্য সাধনা নিয়ে পড়ে থাকায় অন্য অনেক কথাকারের থেকে কম জনপ্রিয়তা পেয়েছেন কিন্তু আধুনিক পাঠকের কৌতূহল তাঁর প্রচেষ্টাকে পুনরাবিষ্কার করে ধন্য হয়েছে।